২০০৩

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ❑ ১২ তম সংখ্যা

৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ ঈসাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Muhtaram Maulana Ataul Mujib Rashed Sahib is delivering lecture while Muhtaram Sahibzada Mirza Wasim Ahmad Sahib is in the Chair.

Muhtaram Sayed Abdul Hai Sahib is seen in the Chair while an African brother is delivering lecture.

Muhtaram Sahibzada Mirza Wasim Ahmad Sahib is seen with Cabinet Minister Punjab Government Partap Singh Bajwa

Muhtaram Maulana Ataul Mujib Rashed Sahib, Mr. Mohammad Shahabuddin, Naib National Ameer-3, Bangladesh & Mr. Mashreq Ali Mullah, Ameer West Bengal-Asam are seen among the persons sitting on the stage.

সালানা জলসায় আমাদের করণীয়

আল্লাহ্‌তাআলার খাস ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৮০তম সালানা জলসার আয়োজন করছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। এ জলসার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ১৮৯১ সনে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কর্তৃক মহান আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সালানা জলসার আলোকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এ সালানা জলসার আয়োজন করে থাকে। তাই এ জলসায় যারা যোগদান করেন তারা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মেহমান; প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌তাআলার মেহমান। জলসায় যারা যোগদান করবেন আর যারা খেদমত করবেন সবাইকে হযরত খলীফাতুল আল্‌ খামেস (আইঃ)-এর ২৫-৭-০৩ তারিখের খুতবাটি ভালভাবে পাঠ করতে বলছি। আমরা সবাই যেন আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করি। জলসায় যোগদানকারী মেহমানদের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দোয়ার প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দোয়া ঃ

"যারা এ লিল্লাহী জলসার উদ্দেশ্যে সফর করেন, খোদা তাদের সহায় হোন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের উপর দয়া পরবশ হোন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দুঃখ-কষ্ট হ'তে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্য-সিদ্ধির পথ তাদের জন্যে উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিনে তাদেরকে খোদা তাঁর সেই সকল বান্দাদের সাথে উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর ফযল ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিততে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন।

হে খোদা! হে মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা! এ সবগুলো দোয়াই তুমি কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর। কেননা, সকল শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই; আমীন, সুম্মা আমীন।
(বিজ্ঞাপন ঃ ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ইং)

যারা কষ্ট স্বীকার করে জলসায় উপস্থিত হচ্ছেন তাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আপনারা সকলে জলসার দিনগুলোতে পুরোপুরি কল্যাণ লাভে সচেষ্ট হবেন বলে আমি বিশ্বাস রাখি। এ কয় দিন জামাতের জন্যে বেশি বেশি দোয়া অব্যাহত রাখবেন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ॥ ১১তম সংখ্যা

১৭ পৌষ ১৪১০ বঙ্গাব্দ ৭ যিলকদ ১৪২৪ হিঃ কাঃ
৩১ ফাতাহ ১৩৮২ হিঃ শাঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ◆ ভারত টাঃ ২০০ ◆ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
ন, ন, মোহাম্মদ সালেক	-	কানাডা
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ডাঃ মাহবুবুল ইসলাম	-	অষ্ট্রেলিয়া
সৈয়্যদ মোহাম্মদ রেজা শাকিল	-	ফ্রান্স

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

অমুসলমান ঘোষণার দাবী অবৈধ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে সরকারীভাবে অমুসলমান ঘোষণার জন্যে খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণ কমিটিসহ কতিপয় মৌলবাদী সংগঠন থেকে আবারও দাবী উঠেছে এবং এ নিয়ে সভা-সমিতি বিক্ষোভ মিছিল মহাসমাবেশ প্রভৃতি করে সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের বিনীত নিবেদন ঃ

১। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণ মুসলমান। আমরা কলেমা-**লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্**-তে পূর্ণ বিশ্বাসী। নবী করীম (সঃ) খাতামান্নবীঈন।'খতমে নবুওয়ত'-এর যত প্রকার অর্থ হতে পারে এর সবটাতে আমাদের ঈমান আছে।

২। হযরত আয়েশা (রাঃ), মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ), মাওলানা রুম (রহঃ), সাইয়্যেদ আব্দুল করীম জিলানী, মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) সহ উম্মতের বহু বিদগ্ধ উলামা ও সলফে সলেহীন খতমে নবুয়তের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন জামাতে আহমদীয়াও সেই বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। উল্লিখিত সংগঠনসমূহ কি তাঁদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবেন?

৩। ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যেমন সংসদ বা সরকারের কাজ নয় তেমনি ধর্ম নিরূপণ করাও কোন সংসদ বা সরকারের কাজ নয়। ধর্ম আল্লাহ্‌র জন্যে এবং তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং কেউ যদি গায়ের জোরে ধর্ম নিরূপণ করার জন্যে হাত বাড়ায় তাহলে তা খোদার উপরে খোদকারী হবে নিঃসন্দেহে। আল্লাহ্‌তাআলা যে এ হাত গুঁড়ো করে দেন ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে।

৪। বাদশাহ্ ফয়সল, লারকানার নবাব জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেনারেল জিয়াউল হক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যারাই আহমদী মুসলমানের বিরুদ্ধে হাত উঠিয়েছে, আল্লাহ্‌তাআলা তাদের হাত গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশে কোন দল বা নেতা যাতে এ ধরনের খোদা-বিরোধী বেআইনী ও অমানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অপচেষ্টা না করেন সেজন্যে আমরা তাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি।

৫। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এর হাজারো রকমের সমস্যা আছে। মোল্লা ভাইয়েরা মনে করেন যে, 'কাদিয়ানী সমস্যা'-ই একটি বড় সমস্যা। পাকিস্তানের মোল্লারাও তাই ভেবে ভুট্টোকে চাপ দিয়ে, তোয়াজ করে এবং ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে 'কাদিয়ানীদের' অমুসলমান ঘোষণা করিয়েছে। ফল কী হয়েছে? এখন মোল্লাদের অবস্থা কী? দেশের বারোটা বাজিয়ে তবে ছেড়েছে। আর আহমদীয়া জামাতের বর্তমান অবস্থা কী? এথেকে বাংলাদেশ সরকার অনায়াসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

৬। মোল্লা ভাইদের প্রতি আবেদন-'আহমদীয়ত' মহান আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক রোপিত একটি বৃক্ষ। যখন এটা কচি চারাগাছ ছিল তখনই আপনাদের কুফরী ফতওয়া এর কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে নি। আর এখন তো এটা বিশ্বের ১৬৭টিরও অধিক রাষ্ট্রে শিকড় বিস্তার করেছে। দিন দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। সুতরাং এর বিরোধিতা থেকে ক্ষান্ত হয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য ঐশী-ব্যবস্থা গ্রহণ করুন অর্থাৎ দোয়ার মাধ্যমে কাজ নিন। মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় ও মনোনীত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে তাঁকে মেনে নিতে সচ্চেতা লোকের কুণ্ঠিত হওয়া কখনও উচিত নয়।

৭৮। আহমদী জামাতের বর্তমান বিরোধিতার পেক্ষাপটে অনেক পত্র-পত্রিকা, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ও সচেতন ব্যক্তিত্ব আমাদের পক্ষে কলম ধরেছেন ও বক্তব্য রাখছেন। আমরা সকলের কাছে শোকরিয়া জ্ঞাপন করি ও তাদের জন্যে দোয়া করি।

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দেখুন)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ আনআম - ৮	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ জলসায় যোগদানের কল্যাণ	ঃ	৩-৪
অমৃত বাণী ঃ তিনি স্বয়ং ফয়সলা করবেন	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	৪
জুমুআর খুতবা ঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর দয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৯
মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তান মেঁ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	১০-১১
যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১২
জুমুআর খুতবা ঃ নেযামে জামাত ও কর্ম-কর্তাদের করণীয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৩-২০
একটি আন্তরিক সদুপদেশ	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	২১-২২
ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)	ঃ সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ - অধ্যাপক মোহাম্মদ আমীর হোসেন	২২-২৩
আমাদের জলসা ঃ আহমদীয়তের সত্যতার নিদর্শন মূল ঃ মোকাররম শাহেদ আহমদ শাহেদ	ঃ অনুবাদ - জনাব কাওসার আলী মোল্লা	২৪-২৭
ছোটদের পাতা ঃ এসো কুরআন শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৮
কবিতা ঃ পুণ্য-গাথা	ঃ জনাব মির্যা আলী আকন্দ	২৯
সংবাদ	ঃ	৩০-৩২

প্রচ্ছদ ঃ দারুল আমান কাদিয়ানের ১১২ তম সালানা জলসা ২০০৩-এর দৃশ্যাবলী

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ)

দৈনিক ইনকিলাব সর্বদা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ছড়ায়। এবার দৈনিক ইনকিলাব প্রাবন্ধিক ও কলামিষ্ট সাদেক খানের একটি প্রবন্ধ ছেপেছে। বিশেষ বিশেষ অংশ এরূপ ঃ "ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হলেও ধর্মীয় ফতওয়া দেয়ার কোন সাংবিধানিক অধিকার প্রজাতন্ত্রের নেই। বরং সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ধর্ম চর্চার সমান অধিকার ও নিরাপত্তা বিধানের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কোন ধর্মীয় নেতা যদি কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা দিতে চান, সে ফতোয়া তিনি দিতে পারেন। কিন্তু কাদিয়ানী মসজিদে বা হিন্দু মন্দিরে যদি মুসল্লীদের ভাংচুর করতে উস্কানী দেন, তবে তিনি শুধু আইন ভঙ্গ করবেন তাই নয়, ইসলামেরও অবমাননা হতে পারে তার ফলে। এদেশের সুফী শিক্ষার অন্যতম মর্মবাণী ছিল ঃ ধর্মভীরু পৌত্তলিকের নিষ্ঠাকেও সম্মান করতে হবে। পৌত্তলিকতার অন্ধ মোহমুক্ত করে তাদেরকেও নৈতিকতা ও মানবতার দীক্ষা দিতে হবে। সুফী সাধকদের অমুসলিম ভক্তের সংখ্যাও কম ছিল না। ...

কাদিয়ানীদের সরকারীভাবে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করার দাবী সম্পর্কে ধর্মমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন, কে মুসলিম কে মুসলিম নয় সেটা বিচারের এখতিয়ার তাঁর নেই। সব সম্প্রদায় ও সব ধর্ম চর্চার স্বাধীনতার সুরক্ষাই তাঁর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। বস্তুতঃ একথা মনে করার কারণ রয়েছে, দেশের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে এই আওয়াজ যারা তুলেছে তারা রাষ্ট্রঘাতী চক্রের খপ্পরে পড়েছে ..." (১১-১২-০৩ তারিখের সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এজন্যে আমরা ইনকিলাব ও জনাব সাদেক খানকে সাধুবাদ দিচ্ছি। - নির্বাহী সম্পাদক

কালামুল ইমাম
নিজ জিহ্বায় লাগাম লাগাও

প্রকৃত তাকওয়া বা খোদা-ভীতি ছাড়া সুখ-শান্তি ও আনন্দ লাভ হতেই পারে না। জানা উচিত, তাকওয়ার অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এগুলো মাকড়শার জালের ন্যায় পিচ্ছিল। তাকওয়া মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ধর্মীয় বিশ্বাস, কথা-চরিত্র প্রভৃতির সাথে সম্পর্কিত। সবচে' নাজুক সম্পর্ক কথার সাথে। কখনও কখনও তাকওয়াকে বিদায় দিয়ে একটি কথা বলা হয় আর মনে মনে আনন্দ লাভ করা হয় যে, আমি এটা বলেছি সেটা বলেছি, যদিও সেটা মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়েছে। এক বুযুর্গ ব্যক্তিকে কোন দুনিয়াদার ব্যক্তি দাওয়াত করেছে। যখন সেই বুযুর্গ খাবার খাওয়ার জন্যে উপস্থিত হয়েছেন তখন সেই দুনিয়ায় অহংকারকারী ব্যক্তি নিজের চাকরকে বল্লো, অমুক থালাটি নিয়ে এসো যা আমি প্রথমবার হজ্জ থেকে নিয়ে এসেছি। আবার বল্লো, অন্য থালাটি নিয়ে এসো যা আমি দ্বিতীয়বার হজ্জ থেকে নিয়ে এসেছি। পরে বল্লো, তৃতীয় বার হজ্জ থেকে যেটি নিয়ে এসেছি সেটিও নিয়ে এসো। সেই বুযুর্গ বল্লেন, তুমি তো বড়ই অনুগ্রহের পাত্র হে! এ তিনটি কথায় তুমি তোমার তিনটি হজ্জকেই বরবাদ করে দিলে। তোমার উদ্দেশ্য এতে কেবল এ কথাই প্রকাশ করার ছিলো যে, তুমি তিন বার হজ্জ করেছো। এজন্যে খোদা শিক্ষা দিয়েছেন যে, মুখকে শামলিয়ে রাখা আবশ্যক আর অর্থহীন অযথা ও অসময়ে নিষ্প্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা উচিত।

দেখো! আল্লাহ্‌তাআলা ইয়্যাকানাবুদু-এর শিক্ষা দিয়েছেন। এখন সম্ভাবনা ছিলো যে, মানুষ নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে ও খোদা থেকে দূরে সরে যায় এজন্যে সাথে সাথেই ইয়্যাকা নাস্তাঈন-এর শিক্ষাও দিয়েছেন যে, এতদ্দ্বারা এটা বুঝবে না যে, আমি যে ইবাদত করি তা নিজ শক্তিতে করি-অবশ্যই নয়। বরং আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য যতক্ষণ না আসে সেই পবিত্র সত্তা যতক্ষণ সৌভাগ্য ও সামর্থ্য না দেন কিছুই হ'তে পারে না। আর **ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্‌তাঈন** এজন্যে বলা হয় নি যে, এতে স্বকিয়তার গন্ধ প্রাধান্য লাভ করতো এবং এটা তাকওয়া পরিপন্থী। তাকওয়াই প্রত্যেক মানুষকে গ্রহণযোগ্য করে। কথা দ্বারাই মানুষ তাকওয়া থেকে দূরে চলে যায়। কথার মাঝে অহংকার করে আর কথায়ই ফিরআওনী গুণের প্রকাশ ঘটে। এ কথার কারণেই গুপ্ত কর্মকে লোক দেখানো কর্মে বদলে দেয়। কথার ক্ষতি অতি শীঘ্র সৃষ্টি হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে ঃ যে ব্যক্তি নাভীর নীচের অঙ্গ ও মুখকে মন্দ থেকে সুরক্ষা করতে পারে তার বেহেশ্‌তের দায়িত্ব আমার। হারাম খাওয়া দ্বারা এত সর্বনাশ হয় না যতটা মিথ্যা কথা দ্বারা হয়ে থাকে। এতদ্দ্বারা এটা বুঝবে না যে, হারাম খাওয়া ভাল কাজ। কেউ এটা মনে করলে এটা মারাত্মক ভুল। আমার বলার উদ্দেশ্য এই, কেউ যদি বাধ্য হয়ে খেয়ে ফেলে তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি সে নিজের মুখে শূকর খাওয়ার ফতওয়া দিয়ে দেয় তখন সে ধর্ম থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত হারামকে হালাল মনে করে। মোট কথা এথেকে জানা গেল যে, কথা বড়ই মারাত্মক বিষয়। এজন্যে মুত্তাকী নিজের কথাকে খুবই সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখে। এজন্যে সে মুখ থেকে তাকওয়ার পরিপন্থী কথা বলে না।

অতএব তোমরা নিজেদের মুখে লাগাম লাগাও। এমন যেন না হয় যে, মুখ তোমাদের ওপরে কর্তৃত্ব করে আর আবোল-তাবোল বকতে থাকো [হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মলফূযাত, ১ম খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা]।

অনুবাদ - নির্বাহী সম্পাদক

কুরআন মাজীদ

সূরা আল্ আনফাল - ৮

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং এ (আল্লাহ্‌র) গৃহের কাছে তাদের উপাসনা কেবল শিস্ ও হাততালি বৈ আর কিছু নয়। 'অতএব তোমরা অস্বীকার করার দরুন শাস্তির স্বাদ ভোগ কর।'

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭। নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে, তারা (লোকদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দেয়ার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয়-করে; তারা তা ব্যয় করে যাবে ঠিকই, কিন্তু (পরিণামে) তা তাদের আক্ষেপের১১১৯ কারণ হবে, এরপর তাদেরকে পরাজিত করা হবে। এবং যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে একত্র করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮। যাতে ভাল থেকে মন্দকে আল্লাহ্ পৃথক করে দেখান এবং মন্দের একাংশকে আরেক অংশের উপর রেখে সবটা স্তুপাকারে জমা করেন এরপর এটাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। এরাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত। ৪ রুকূ

১১১৯। এ উক্তির মাঝে এই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাফিররা যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছিল তা তাদের জন্য মনস্তাপ ও কষ্টের কারণ হবে, কেননা ইসলাম ধর্মকে বিনষ্ট করার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, এবং তাদের সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করে এর উন্নতি করে এ সম্পদ ব্যয় করবে।

হাদীস্ শরীফ

জলসায় যোগদানের কল্যাণ

وفي روايةٍ لمسلمٍ عَنْ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ : « إنَّ للهِ مَلائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكرِ ، فَإذَا وَجَدُوا مَجلِساً فيهِ ذِكْرٌ ، قَعَدُوا مَعَهُم ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوا ما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنيا ، فَإذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدوا إلى السَّمَاءِ ، فَيَسْألُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَهُوَ أعْلَمُ ـ : مِنْ أيْنَ جِئْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ في الأرْضِ : يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيُهَلِّلُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيَسْألُونَكَ. قالَ : وَمَاذَا يَسْألُوني ؟ قَالُوا : يَسْألُونَكَ جَنَّتَكَ . قالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتي ؟ قالُوا : لا ، أيْ رَبِّ : قالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتي ؟ ! قالُوا : وَيَسْتَجِيرُونَكَ . قال : وَمِمَّ يَسْتَجِيرُوني ؟ قالوا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ . قالَ : وَهَلْ رَأَوْا نَاري ؟ قالوا : لا ، قال : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَاري ؟ ! قالُوا : وَيَسْتَغْفِرُونَكَ ، فيقول : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَأَعْطَيْتُهُمْ ما سَألُوا ، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قَالَ : فَيَقُولُونَ : رَبِّ فيهِمْ فُلانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إنَّمَا مَرَّ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ ، فيقولُ : ولَهُ غَفَرْتُ ، هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » .

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'মহান আল্লাহ্‌তাআলার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তাহারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হইতে থাকে, তাঁহারা তাহাদের সহিত বসিয়া পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তাহারা একে অপরকে আবৃত করেন। এমনকি তাহাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হইয়া যায়। (টীকা ঃ এই রকম মজলিসের উপর খোদাতাআলা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করিয়া থাকেন তাহাই রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন. ইহাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না)। অতঃপর যখন লোকেরা সেই মজলিস হইতে উঠিয়া যায় তখন ফিরিশ্‌তাগণও আকাশে চলিয়া যায়। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি তাহাদের অপেক্ষা বেশি জানেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?' তখন তাহারা উত্তর দেন, 'আমরা তোমারই সেই সকল বান্দার নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করিতেছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করিতেছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচ্‌ঞা করিতেছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহারা আমার নিকট কী যাচ্‌ঞা করিতেছিল'? ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'তাহারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচ্‌ঞা করিতেছিল'। আল্লাহ্ পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'তাহারা কি আমার জান্নাত দেখিয়াছে?' ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! না, তাহারা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হইত যদি তাহারা আমার জান্নাত দেখিত!' তাহারা বলেন, 'তাহারা তোমার নিকট তোমার আশ্রয়ও প্রার্থনা করিতেছিল।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহারা কী হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিল?' ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! তাহারা (দোযখের) আগুন হইতে আশ্রয় চাহিয়াছিল'। তিনি বলেন, 'তাহারা কি আমার আগুন দেখিয়াছে?' তিনি আরো বলেন, 'তাহাদের কী অবস্থা হইত যদি

তাহারা আমার আগুন দেখিত।' তখন তাহারা বলেন, 'তাহারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিলো।" তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তাহারা আমার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছে তাহা আমি তাহাদিগকে দান করিলাম এবং তাহারা যাহা হইতে আশ্রয় চাহিয়াছিল তাহাদিগকে আশ্রয় দিলাম।' তখন তাহারা বলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্যে অমুক তো অত্যন্ত গুনাহ্গার বান্দা ছিল যে সেই জায়গা অতিক্রম করিতেছিল এবং সে তাহাদের সহিত দর্শকের ন্যায় বসিয়া গেল।' তিনি বলেন, 'আমি তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দিলাম, কেননা, তাহারাতো সেই সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাহাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সে-ও বঞ্চিত হইবে না' (মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্র)।

"আন আবি যাররিন ক্বলা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, তাবাস্সুমুকা ফি ওয়াজহি আখীকা সদাকাতুন ওয়া আম্রুকা বিল মা'রূফে ওয়া নাহ্ইউকা আনিল মুনকারে সাদাকাতুন ওয়া ইরশাদুকার্ রাজুলা ফি আরযিয্ যালালে লাকা সদাকাতুন ওয়া ইমাতাতুকাল হাজারা ওয়াশ্ শাওকা ওয়াল্ আয্মা আনিত্ত্বরীকে লাকা সদাকাতুন ওয়া ইফ্রাউকা মিন দাল্ওয়েকা ফি দাল্ওয়ে আখীকা লাকা সদাকাতুন।" এ হাদীসটি তিরমিযীর 'আবওয়াবুল বির্রে ওয়াস্যিলাহ্' থেকে গৃহীত। অর্থাৎ "হযরত আবূ যর গিফ্ফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের সাক্ষাতে তোমার স্মিত হাসি তোমার জন্য সদকা তথা পুণ্যস্বরূপ। তেমনি সৎকাজের আহ্বান ও অসঙ্গত কাজ হতে বারণ করা তোমার জন্য পুণ্যস্বরূপ, পথহারা কোন ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেয়া তোমার জন্যে পুণ্যস্বরূপ, কোন অন্ধের হাত ধরে পথ অতিক্রম করে নিয়ে যাওয়া তোমার জন্যে পুণ্যস্বরূপ, পথ থেকে কষ্টদায়ক পাথর, কাঁটা বা হাড়-গোর দূর করা তোমার জন্যে সদ্কাস্বরূপ, এবং তোমার প্রাপ্য বা ন্যায্য অধিকার হ'তে কিছু তোমার ভাইকে দান করা তোমার জন্যে সদ্কাস্বরূপ।"

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

তিনি স্বয়ং ফয়সালা করবেন

"এখন এ মোকদ্দমা তিনি নিজে ফয়সালা করবেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকি তবে এটা সুনিশ্চিত যে, আকাশ আমার পক্ষে এক জবরদস্ত সাক্ষ্য প্রদান করবে, যদ্দ্বারা মানবদেহ শিউরে উঠবে। আমি যদি পঁচিশ বছর কাল যাবৎ (১৮৮১ইং-১৯০৬ইং) এরূপ এক অপরাধী হয়ে থাকি যে, এ সুদীর্ঘকাল ব্যাপী খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা ও রটনা করছে, তা হ'লে আমি কি রেহাই পেতে পারি?! এমতাবস্থায় যদিও তোমরা সকলেই আমার বন্ধু হয়ে যাও, তথাপি আমি প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত (অর্থাৎ আমার ধ্বংস অবধারিত)। কেননা খোদাতাআলার হাত আমার বিরুদ্ধে সক্রিয় হবে। হে জনগণ! স্মরণ রাখবেন, আমি মিথ্যাবাদী নই, বরং মজলুম ও অত্যাচারিত; আমি মিথ্যাদাবীদার নই, বরং সত্যবাদী এবং আদিষ্ট। আমার উপর অত্যাচারের এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে। আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে যা খোদাতাআলা বলেছিলেন, তা 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, এটা খোদাতাআলার এক ইলহাম বা ঐশীবাণী ঃ 'দুনিয়া ম্যাঁ এক এক নযীর আয়া, পর দুনিয়া নে উসকো কবুল না কিয়া, লেকিন খোদা উসে কবুল করেগা, আওর বড়ে জোর আওর হামলুঁ সে উসকি সাচ্চাই যাহের কর দেগা" অর্থাৎ পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করল না, কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং অত্যন্ত প্রচন্ড শক্তিশালী আক্রমণসমূহের দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দেবেন। এটা সেই সময়কার ইলহাম, যখন আমার পক্ষ হতে কোন 'দাওয়াত' বা দাবীও পেশ করা হয় নি এবং আমার কোন অস্বীকারকারীও ছিল না" (হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থের পৃঃ ১৩৮, ১৯০৬ সনে প্রণীত)

ওঠ! তওবা কর, নিজেদের মালিক আল্লাহ্কে সৎকর্মের দ্বারা সন্তুষ্ট কর। হিন্দু খৃষ্টান বা মুসলমান হওয়ার ফয়সালা কিয়ামতের দিনই হবে।

'ওঠ! তওবা কর এবং নিজেদের মালিক (আল্লাহ্তাআলা)-কে পুণ্য কাজের দ্বারা সন্তুষ্ট কর। স্মরণ রাখবে, বিশ্বাস বা আকীদাগত ভুল-ভ্রান্তির শাস্তি তো মৃত্যুর পরপারে নির্ধারিত, এবং হিন্দু, খৃষ্টান অথবা মুসলমান হওয়ার ফয়সালা কিয়ামতের দিনেই হবে কিন্তু যে ব্যক্তি জুলুম, অধিকার লঙ্ঘন, পাপাচার, অবাধ্যতা ও অনাচারের সীমা অতিক্রম করে যায় তাকে ইহকালেই শাস্তি দেয়া হয়; তখন সে খোদাতাআলার শাস্তি হতে পলায়ন করতে পারে না। সুতরাং তোমাদের খোদাকে শীঘ্র সন্তুষ্ট করে নাও। স্মরণ রাখবে, তোমরা নিজেদের আমলের জোরে কখনও নাজাত লাভ করতে পারবে না। সর্বদা ফযল ঐশী-কৃপা মানুষকে রক্ষা করে, কর্ম নয়। হে করীম ও রহীম খোদা! আমাদের উপর ফযল বর্ষণ কর, আমরা যে তোমারই বান্দা এবং তোমার আস্তানায় পড়ে আছি, আমীন" (লেকচার লাহোর, পৃঃ ৩৯)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

আঁ হযরত (সঃ)-এর দয়া

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহার পর নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে খুতবা দেন ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় তোমাদেরই মাঝ থেকে একজন মহান রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তার জন্য দুঃসহ, সে অতিশয় শুভাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি সে পরম মমতাশীল ও দয়ালু (সূরা তওবা ঃ ১২৮)।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) কখনও কোন কঠোর বা তীব্র ভাষা ব্যবহার করেন নি। হুযূর (সঃ) সবচেয়ে বেশি কোমল হৃদয়ের ছিলেন। সবচেয়ে বেশি ভদ্র ছিলেন। যখন হুযূর বাড়ীর ভেতরে থাকতেন অতি সাধারণ মানুষের মত আচরণ করতেন। কখনও তাঁর মুখ ভারী বা চেহারা কঠিন হতো না। সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ কথাও বলেছেন যে, হযরত নবী (সঃ) কখনও কোন স্ত্রী বা চাকর বা দাস-দাসীকে মারেন নি বা গায়ে হাত তুলেন নি।"

কোন কোন ব্যক্তি কুরআনের আয়াত "ফাযরিবহুন্না-অর্থ তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) মার" এর ব্যাখ্যায় মনে করে, স্ত্রীদেরকে মার-ধর করা উচিত। একবার এক আহমদী সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, সে স্ত্রীকে মার-ধর করত। এখন হয়ত এমন করে না। কিন্তু সে সামান্য কথায় স্ত্রীকে খুব মার-ধর করত। কুরআন শরীফ হযরত নবী করীম (সঃ)-এর উপর নাযেল হয়েছে। তিনি এর অর্থ সবচেয়ে ভাল করে জানতেন। হুযূর (সঃ)-এর স্ত্রীদের কেউ কখনও 'নুসূয (বিদ্রোহ) করেন নি। কুরআনে যেখানে মারার কথা বলা হয়েছে সেখানে নুসূযের কথা বলা হয়েছে। নুসূয

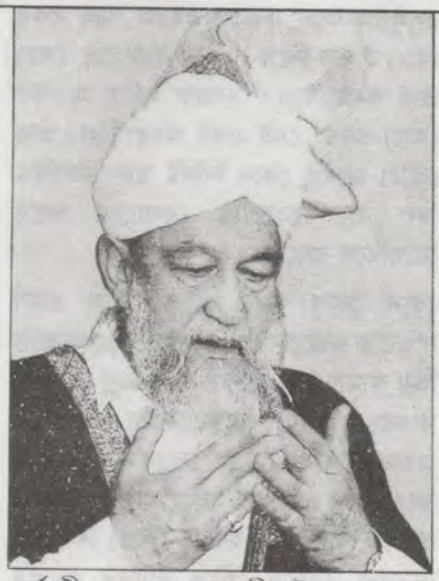

অর্থ স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর উপর আক্রমণ বা মার-ধর করা বুঝায়। কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে মারতে দ্বিধা করে না। কোন কোন স্বামী বেচারা মার খেতে থাকেন ভিজা বিড়ালের মত। আমার জানা ছিল, এক ব্যক্তি এমন ছিলেন যে, স্ত্রীর হাতে খুব মার খেতেন। অতএব কুরআনী আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। হযরত রসূলে করীম (সঃ), যাঁর উপর কুরআন নাযেল হয়েছে তিনি কুরআনী আয়াতের অর্থ সবচেয়ে ভাল জানতেন। হুযূর (সঃ)-এর চেয়ে ভাল তফসীর কেউ করতে পারে না। অতএব আঁ হযরত কখনও কোন স্ত্রী বা কোন দুর্বলের উপর হাত তুলেন নি।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সঃ) নিজ হাতে উটের সামনে ঘাস বা চারা রাখতেন বা খাওয়াতেন, গৃহের কাজ-কাম করতেন; নিজের জুতো মেরামত করতেন; কাপড়ে জোড়াতালি লাগাতেন। বক্‌রীর দুধ দুহাতেন। চাকরকে নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়াতেন। আটা পিশ্‌তে পিশ্‌তে চাকর ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে সাহায্য করতেন। বাজার হতে দ্রব্যাদি কিনে ব্যাগ নিজে বয়ে আনতে কখনও লজ্জাবোধ করতেন না। আমীর গরীব প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করতেন। প্রথমে 'সালাম' বলতেন। কেউ সামান্য খেজুর খেতে নিমন্ত্রণ করলে তাতে তিনি সানন্দে অংশগ্রহণ করতেন তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না। হুযূর (সঃ) অত্যন্ত সমবেদনাশীল ও দয়ালু, নম্রস্বভাবের ছিলেন। তাঁর (সঃ) বসবাস খুব সাদাসিদা কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। প্রত্যেকের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর (সঃ) চেহারায় সর্বদা হাসি খেলা করত। কখনও উচ্চ স্বরে অট্টহাসি করতেন না। আল্লাহ্‌র ভয়ে চিন্তিত থাকতেন সবসময়। কিন্তু কখনও চেহারায় কঠোরতা বা শুষ্কতা আসত না। অত্যন্ত নরম মেজাযের ছিলেন। কিন্তু এর মাঝে কোন দুর্বলতার চিহ্ন ও সাহসিকতার অভাব থাকত না। বড়ই দানশীল ছিলেন, কিন্তু কখনও অপচয় করতেন না। বড় কোমল হৃদয়, মমতাশীল, দয়ালু ছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানের সাথে মায়া-মমতার আচরণ করতেন। তাঁর কাছ থেকে কখনও লোভ-লালসা প্রকাশ পায় নি। অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও শোকরগুযার (কৃতজ্ঞতায় ভরপুর) থাকতেন। স্বল্পে তুষ্ট থাকতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবূ বকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তাকে বলেছেন। হুনায়েনের যুদ্ধে আমার পা আঁ হযরত (সঃ)-এর পায়ের উপর পড়েছিল। আঁ হযরত (সঃ) তখন আমাকে ছড়ি মেরেছিলেন। খুব আস্তে মেরে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। সে বলেছে, সারা রাত আমার ঘুম আসে নি। আমার দ্বারা এ কী রকম বেআদবী হয়ে গেল! সকাল সকাল আমি পয়গাম পেলাম, হুযূর (সঃ) আমাকে ৮০টা ছাগল দিয়ে বললেন, কাল আমি তোমাকে ছড়ি মেরেছিলাম রাগ করে, এটা তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাকে দিলাম।

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কথা বলছি। গাফ্‌ফার নামের এক বালক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে থাকতেন। কীভাবে গাফফার হযরত

(আঃ)-এর সংস্পর্শে এসেছিলেন এ প্রসঙ্গে হযরত ইরফানী (রাঃ) লিখেছেন। তার সাথে হযরত (আঃ)-এর ব্যবহার দেখে হযরতের (আঃ) চরিত্রের বিভিন্ন দিক বুঝা যায়।

মিঁয়া গাফ্ফার বলেছেন, 'আমার বয়স তখন ১৩/১৪ বছর। আমি একদিন বড় মসজিদের উঠানে শুয়ে শুয়ে ছাগলের মত দানা চিবুচ্ছিলাম। হযরত আকদস (আঃ) এসে আমাকে দেখে আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এরপর আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। এবং দু'খানা খামিরা রুটি আমাকে দিলেন। এভাবে প্রতিদিন আমি আমার খাবার পেয়ে যেতাম। কখনও সেখানে খেতাম কখন খাবার নিয়ে নিজ ঘরে চলে আসতাম। আমার কোন কাজ-কাম ছিল না। আমাকে কোন কাজের জন্য বলতেন না। আস্তে আস্তে যখন বেশি পরিচিত হয়ে গেলাম তখন আমাকে এবং অপর একজনকে হুযূর নামাযের জন্য বল্লেন। তিনি নিজেই কয়েকটি সূরা মুখস্থ করিয়ে দিলেন। আমরা বড় পাক্কা নামাযী হয়ে গেলাম।

হযরত (আঃ) মিঁয়া গাফ্ফার এবং তার সমবয়সী ছেলেদেরকে দুরূদ শরীফ বার বার পড়তে বললেন। বিশেষ করে শয়নকালে দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যেতে বললেন। কেউ যদি কোন স্বপ্ন দেখত তবে সকালে সে হযরতকে শোনাত। হুযূর এর ব্যাখ্যা করতেন। অধিকাংশ সময় স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হতো।

মিঁয়া গাফ্ফারের বিয়ের সময় বিয়ের মোট খরচের একটা বড় অংশ হযরত (আঃ) দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি অনাথদের সাহায্য করতেন।

হযরত আকদস (আঃ)-এর সেবকদের এক জনের নাম ছিল পিরা। সম্পূর্ণ মূর্খ ও অবুঝ ছিল। তার দ্বারা বেওকুফীর আচরণ খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হযরত (আঃ) কখনও তাকে বকাঝকা করেন নি।

এবার আঁ হযরত (সঃ)-এর সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি।

আঁ হযরত (সঃ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসতেন, বহিরাগতদের জন্য চিনতে কঠিন হোত যে, কে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। অনেক সময় অনেকে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ্ মনে করত। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ইঙ্গিত দিতেন, 'ইনি রসূলুল্লাহ্, (সঃ) তাঁর কাছে যাও।' হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এরও সেই একই অবস্থা ছিল। তাঁর (আঃ) জন্যও কোন নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারিত ছিল না, সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলেমিশে বসতেন।

কোন কোন সময় কোন ব্যক্তি এমন দাওয়াত করতেন যে, সেখানে বড়দের জন্য ভিন্ন কামরা নিম্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন কামরায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হতো। একবার একজন ধনী ব্যক্তি সেরকম দাওয়াত করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জানতে পারলেন। হযরত (আঃ) নির্ধারিত কামরার দরজায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চাকরকে বললেন, 'আপনি প্রথমে ভেতরে যাবেন।' মেযবানের (নিমন্ত্রণ - কারী) কিছু বলার সুযোগ থাকল না। এরপর খাওয়ার টেবিলেও নিজের পাশে চাকরদের বসালেন এবং বড় আদর সম্মান করে খাওয়ালেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) শিশুদের সাথে বড় স্নেহ ও ভালবাসার ব্যবহার করতেন। হাসি ঠাট্টা করতেন, খেলতেন তাদের মনোরঞ্জন করতেন। হযরত জাবের বিন ছামরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে ফজরের নামায পড়েছি। হুযূর (সঃ) ফজরের পরে বাড়ীর ভেতরে যাচ্ছিলেন। আমিও সাথে যাচ্ছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আরো শিশুরা অপেক্ষা করছে। হুযূর (সঃ) তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আমার মাথার উপরও হুযূর হাত বুলিয়ে দিলেন। আমার মনে হচ্ছিল, হুযূরের হাতে অনেক কোমলতা ও সৌরভে ভরা যেমন এখনই আতরের মাঝ থেকে হাত বের করেছেন।

হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে নবজাত শিশুদের নিয়ে হাজির করা হোত। হুযূর (সঃ) মোবারকবাদ দিতেন। দোয়া করতেন এবং গুড়তি দিতেন (নবজাতকের মুখে কিছু দিতেন)। অতএব আজকাল গুড়তি দেবার প্রথা আঁ হযরত (সঃ) থেকে প্রচলিত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালামের ছেলে বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) আমার নাম ইউসুফ রেখে দিলেন, আমাকে কোলে বসিয়ে আদর করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। তার সাথে তার সন্তান ছিল। সে ব্যক্তি আদর করে সন্তানকে নিজের শরীরের সাথে লাগাচ্ছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) বল্লেন, তুমি কি তাকে স্নেহ কর? সে বলল, 'জ্বী হুযূর!' তিনি বল্লেন, তুমি যতটা তাকে স্নেহ করছ আল্লাহ্ তোমার প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশি দয়া করবেন। তিনি সবার চেয়ে বেশি করুণাময় ও দয়ালু।'

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) তাঁর দৌহিত্র হাসান বিন আলীকে চুম্বন করলেন। আকরা বিন হারেস্ আমিনী নিকটেই বসেছিলেন, সে বলল, আমার তো দশটি সন্তান আছে, কিন্তু আমি তো কখনই কাউকে চুম্বন করি নি। আঁ হযরত (সঃ) তার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "যে দয়া করে না তার প্রতি দয়া দেখানো হবে না।"

হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, "কথা-বার্তা বলার ভঙ্গিমার দিক থেকে ফাতেমার কথাবার্তা আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে অনেক মিল রয়েছে। এতে বেশি মিল অন্য কারো কথার মাঝে আমি দেখি নি। যখন ফাতেমা আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে আসলে হুযূর (সঃ) তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন, স্বাগতম জানাতেন, তাকে চুম্বন করতেন এবং নিজ স্থানে বসাতেন। আঁ হুযূর (সঃ) যখন ফাতেমার কাছে যেতেন, ফাতেমা দাঁড়িয়ে যেতেন। হুযূর (সঃ)-এর হাত ধরে হাতে চুমা খেতেন এবং স্বাগতম জানাতেন এবং নিজের বসার স্থানে বসাতেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর ইন্তেকালের পূর্বে ফাতেমা যখন দেখতে আসলেন, তখনও আঁ হযরত (সঃ) পূর্বমত তাকে স্বাগতম জানালেন, আদর করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জা'ফর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) যখন কোন সফর হতে ফেরত আসতেন, হুযূর (সঃ)-এর পরিবারের শিশু-সন্তানরা হুযূর (সঃ)-কে স্বাগতম জানাবার জন্য এগিয়ে যেতেন। একবার যখন হুযূর (সঃ) ফেরত আসছিলেন তখন হুযূর (সঃ)-কে স্বাগতম জানাবার জন্য এগিয়ে যেতে আমার সুযোগ হয়েছিল। আমাকে হুযূর (সঃ) কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তারপর হযরত ইমাম হাসান ও হোসেইন-এর একজনকে হুযূর পেছনে উটের উপর বসিয়ে নিয়েছিলেন এবং এভাবেই আমরা মদীনায় প্রবেশ করেছিলাম।

আদী বর্ণনা করেছেন, 'আমি বরআ বিন আযেব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে দেখেছি, হুযূর (সঃ) ইমাম হাসানকে নিজ কাঁধের উপর উঠিয়ে রেখেছেন এবং দোয়া করছেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি তুমিও একে ভালবেসো।

হযরঁত উসামা বিন যায়েদ বর্ণনা করেছেন, 'একবার আঁ হযরত (সঃ) আমাকে কোলে নিয়ে এক রানের উপর বসিয়ে নিলেন, অন্য রানের উপর হযরত হাসানকে। তারপর আমাদেরকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং বলছিলেন, 'আল্লাহুম্মার হামহুমা ফাইন্নি আরহামুহুমা" হে আল্লাহ্! এদের দু'জনের প্রতি দয়া কর, আমি এদের প্রতি দয়া করি।"

সুব্বা বিন মাররা বর্ণনা করেছেন, "আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে এক দাওয়াতে যাবার জন্য বেরিয়েছিলাম দেখি, হোসেইন রাস্তায় খেলছে। আঁ হযরত দ্রুত অগ্রসর হয়ে আগে গিয়ে দু' হাত প্রসারিত করে হুসেইনকে ঘিরে ফেললেন। শিশু হোসেইন এদিক সেদিক দৌড়াচ্ছিল ও বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।"

হুযূর (সঃ)-এর আদরের বহিঃপ্রকাশ এভাবেই হয়েছিল। ধরতে চেষ্টা করছিলেন। ধরতে পারতেন। কিন্তু ধরছিলেন না যেন খেলা চলতে থাকে। শিশু হোসেইন হেসে যাচ্ছিল। অবশেষে হুযূর (সঃ) তাকে ধরে ফেললেন। এক হাত চিবুকের নীচে অন্য হাত মাথায় রেখে শিশুকে উঁচু করছিলেন। পরে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, "হুসেইনো মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসেইন" অর্থাৎ হুসেইন আমার আমি হুসেইনের। আল্লাহ্ তাকে ভালবাসুন যে হুসেইনকে ভালবাসে হুসেইন আমার দৌহীত্রদের একজন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ইলহাম আছে- "আনতা মিন্নি ওয়া আনা মিনকা"। মৌলভীরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যে, মির্যা সাহেবের ইলহাম দেখ! আল্লাহ্র মধ্য থেকে।" অথচ এর অনুবাদ হবে, "আমি আল্লাহ্র আল্লাহ্ আমার।" (সম্পর্কের ব্যাপার)।

হযরত আবূ কাতাদা আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূল (সঃ) কোন কোন এমন অবস্থায় নামায পড়তেন যে, নিজ নাতনী উমামা, হযরত যয়নাব এবং আবুল আস এর মেয়েকে কোলে নিয়ে নিতেন। যখন হুযূর (সঃ) সিজদায় যেতেন তো উমামাকে বসিয়ে দিতেন। আবার যখন দাঁড়িয়ে যেতেন তাকে কোলে নিয়ে নিতেন।"

আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, এভাবে নামায নষ্ট হয়। যেমন এক ব্যক্তি এমন রেওয়ায়াত শুনে বলে উঠে ছিল, "উহ্, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামায নষ্ট হয়েছে।" অথচ হুযূর (সঃ)-এর হৃদয় ও মেধা বা চিন্তা আল্লাহ্র প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ফার্সীতে কথা আছে, 'দাস্ত বাকার দিল্ বাইয়ার' হাতে কাজ, অন্তর প্রিয়জনের (আল্লাহ্র) স্মরণে। হুযূর (সঃ) শিশুদের প্রতি মমতাময় ছিলেন বলে এমন হতো নতুবা হুযূর (সঃ)-এর ধ্যান বা দৃষ্টি আল্লাহ্র দিক থেকে সরে নি।

আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ নিজ পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) নামায পড়াতে আসলেন। কোলে হাসান অথবা হোসেইনকে নিয়ে আসলেন। আঁ হযরত (সঃ) নামায আরম্ভ করার সময় সেই শিশুকে ডান পাশে বসিয়ে রাখলেন। আঁ হযরত (সঃ) সিজদায় গিয়ে দেরী করলেন, 'আমার আব্বা বলেছেন, 'আমি মাথা উঁচু করে দেখলাম, ব্যাপার কি এত লম্বা সিজদা। দেখলাম, হুযূর (সঃ) তখনও সিজদায় আছেন এবং সেই শিশু হুযূরের পিঠের উপরে বসে আছে। আমি আবার সিজদায় চলে গেলাম।' তারপর নামায শেষ হলে কেউ কেউ বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি একটি সিজদা অনেক দীর্ঘ করেছেন। আল্লাহ্র কোন আদেশ ছিল কি না।' হুযূর (সঃ) বললেন, 'আমার পিঠে এ শিশু ছিল। আমি চাচ্ছিলাম না যে শিশুকে নামিয়ে দেই যতক্ষণ সে নিজে না নেমে যায়। তাই সিজদা লম্বা হয়েছে"।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে আকরম (সঃ)-এর এক মেয়ে হুযূরকে পয়গাম পাঠালেন, তাঁর মেয়ের শেষ সময়, হুযূর (সঃ) আসুন। উসামা বলেছেন, আমরা হুযূর (সঃ)-এর সাথে সাথে তাঁর (সঃ) মেয়ের ঘরে গেলাম। নাতনীর শেষ মুহূর্ত ছিল। হুযূর (সঃ) নিজ কন্যাকে ধৈর্যের কথা বললেন। হুযূর (সঃ)-এর কোলে সেই বালিকা শিশুকে দেয়া হলো। হুযূর (সঃ)-এর চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসতে থাকল। কেউ একজন বলল, হুযূর! এ কেমন কথা? হুযূর (সঃ) বললেন, 'এতো রহমতের (দয়ার) অশ্রু।' আল্লাহ্ যার হৃদয়ে রহমত দিতে চান দিয়ে দেন। যারা অন্যদের প্রতি দয়া করে তাদের প্রতি আল্লাহ্ও দয়া করেন।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে আবূ ইউসুফ হাদ্দামের বাড়ী গেলাম। সেখানে হযরত ইব্রাহীম [আঁ হযূর (সঃ)-এর সন্তান] থাকতেন। হুযূর (সঃ) ইব্রাহীমকে ধরে চুমু খেলেন। অন্য একবার যখন হুযূর (সঃ) সেখানে গেলেন তখন হযরত ইব্রাহীমের মুমূর্ষু অবস্থা চলছিল। হুযূর (সঃ)-এর চোখ থেকে অশ্রু বেরুতে শুরু করল। এ অবস্থা দেখে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনিও (কাঁদছেন)?' হযরত (সঃ) বললেন, 'ইবনে আউফ! এ তো রহমত!' তারপর হুযূর (সঃ) বললেন, 'চোখ অশ্রু বিসর্জন করছে হৃদয় বেদনা বিধুর; কিন্তু আমরা কেবল সে কথাই বলব যাতে আমাদের প্রিয় খোদা খুশী হবেন। হে ইব্রাহীম! তোমার বিদায় এতে আমরা ব্যাথিত।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা রাখতেন। বিশেষ করে হযরত মির্যা মোবারক আহমদ, যিনি সবার ছোট ছিলেন। একে বড় বেশি ভালবাসতেন। তাদেরকে কখনও মারতেন না। কিন্তু একবার ছোট্ট ছেলেটির হাতের থাবায় কুরআন শরীফ পড়ে যাচ্ছিল- হুযূর (সঃ) তাড়াতাড়ি কুরআন ধরে ফেললেন এবং ছেলের মুখে চপেটাঘাত করলেন। হযরত (আঃ) অত্যন্ত নরম প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের ভালবাসায় ছেলেকে মারলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ নযম-এর একটি পংক্তিতে আছে, "কুরআনের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরপাঁক খেতে থাকি আমার কা'বা তো এটিই।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বড়ই গভীর মনোযোগ দিয়ে কুরআন পড়তেন এবং পড়তে পড়তে বিমোহিত হয়ে পড়তেন।

হযরত (আঃ) কারো সন্তানের জন্মের খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে তাদের মোবারকবাদ দিতেন। অত্যন্ত গরীব মানুষের অসুস্থতার খবর পেলেও সেখানে যেতেন। দেখা-শোনা করতেন। দোয়া করতেন। বার বার খবর নিতেন। কারো আরোগ্যের খবরে খুব খুশি হতেন যেন নিজ সন্তান আরোগ্য লাভ করেছে। অনেক ঘটনা রয়েছে। কিন্তু বেশি বলার সময় নেই।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। অনেকবার দেখেছি, শিশুরা এসে হযরতের চার পাইয়ের উপর বসতে থাকে। হযরতকে চার পাইয়ের কিনারে বসতে বাধ্য করে (অর্থাৎ নিজে সরে গিয়ে শিশুদের বসার স্থান করে দিতে থাকেন এভাবে হযরত এক সময় শেষ প্রান্তে সরে আসেন)। তারপর তারা তাদের ভাষায় কাক, চড়ুই এবং ব্যাঙের গল্প শোনাতে থাকে। অনেক সময় ধরে তারা তাদের গল্প শোনাতে থাকে। আর হযরত সাহেব মজা করে শুনতে থাকেন। যেমন কাউকে শিখানো হচ্ছে।

হযরত (আঃ) শিশুদের বকাঝকা বা ধমক দেয়া অথবা মার-ধর করার কঠোর বিরোধী ছিলেন। শিশুরা যতই বিরক্ত করুক না কেন, খামাখা প্রশ্ন করে করে যতই উত্যক্ত করুক না কেন, কোন কারণেই তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতেন না। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, বুঝাতেন।

আজও আমাদের ছেলে-মেয়েদের তরবিয়তের এটাই পদ্ধতি এটাই হওয়া উচিত। খুবই নম্রতা দেখানো উচিত।

মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর বয়স তখন তিন বছর হবে। একবার লুধিয়ানায় হুযূর (আঃ) অবস্থান করছিলেন। আমিও সাথে ছিলাম। আমার কামরা হযরত (আঃ)-এর কামরার পাশেই ছিল। মধ্য রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুনতে পাচ্ছিলাম- মিঁয়া মাহমুদ কাঁদছেন আর হযরত (আঃ) তাকে আদর করে চুপ করাতে চেষ্টা করছেন। হযরত (আঃ) কোলে করে হাঁটা-হাঁটি করছিলেন। মিঁয়া মাহমুদ কোন মতেই চুপ করছিলেন না। এক সময় হযরত সাহেব বললেন, দেখ মাহমুদ আকাশে কী সুন্দর তারা! মিঁয়া মাহমুদ এবার একটি নতুন সূত্র পেলেন। বারবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'আব্বু তারে জানা' তারা-য় যাব। হযরত (আঃ) বড় আদর যত্নে ছেলেকে চুপ করাতে চেষ্টা করতে থাকলেন। বিরক্ত হয়ে একবারও ধমক দিলেন না। পিতা-পুত্রের এমন বাক্যালাপ আমার কাছে খুবই ভাল লাগছিল। অবশেষে মিঁয়া সাহেব এক সময় নিজে নিজে চুপ করে গেলেন।

হযরত সাহেব অন্যান্য শিশুদেরকেও নিজ সন্তানদের মতই আদর যত্ন করতেন। একবার হযরত নিজের এক ছেলের হাতে অনেকগুলো আম দিলেন এবং বললেন, তোমার সাথের ছেলেদের মাঝে বিতরণ কর। হযরত নিজেও যখন কিছু বিতরণ করতেন তখন সাথের সব ছেলেদের মাঝে বিতরণ করতেন। চাকরদের ছেলে-মেয়েরা হযরতের গৃহে যারা ছিল তারা রাজকীয় জীবন যাপন করত। হযরত সাহেব সাধারণতঃ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে চাকরদের সন্তানদেরকে নিজের সন্তানদের থেকে পৃথক করে দেখতেন না। কোন কিছু ছেলেমেয়েকে দিতেন তখন সবাইকে দিতেন। তখন বাইরের কোন শিশু এসে গেলে তাকেও দিতেন। সারা জীবনই এমন আচরণ করেছেন। শেষ জীবনে তো কোন কোন এতীম সন্তানদের বিশেষভাবে দেখা - শোনাই করতেন। যথারীতি আর্থিক সহযোগিতা করতেন।

আমি নিজেও আমার মেয়েদের এভাবেই তরবিয়ত করেছি। আমি যখন মেয়েদের খাবারের জন্য কিছু দিতাম তারা সেগুলো নিয়ে বাইরে চলে যেত এবং চাকর-বাকরদেরকে অংশ দিত। আপনাদেরও উচিত এমন করে ছেলে-মেয়েদের তরবিয়ত করা। যখন তারা নিজেরা কিছু খায় তখন যেন গবীর ছেলে-মেয়েদেরও অংশ দেয়।

হযরত সাহেবযাদা পীর সিরাজুল হক নোমানী বর্ণনা করেছেন। হযরত (আঃ) প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। মাত্র সূর্য উদয় হয়েছে। শীতের দিন। ১৫/১৬ জন সাহাবা সাথে ছিলেন। পরে আরো অনেকেই এসে শামেল হলেন। হযরত মির্যা মাহমুদ এবং মির্যা বশীর আহমদও এসে গেলেন। ছোট ছিলেন। মিঁয়া বশীর আহমদ খালি পায়ে এবং মাথায় টুপিও ছিল না। হযরত (আঃ) হেসে বললেন, মিঁয়া বশীর! জুতো টুপী কোথায় ফেলে এসেছ? মিঁয়া বশীর কোন উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে অন্য সমবয়সীদের সাথে সামনে চলে গেলেন। হযরত (আঃ) হাসতে হাসতে বললেন, শিশুদের অবস্থাও অদ্ভুত হয়ে থাকে। এ ক'দিন পূর্বে মিঁয়া বশীর জিদ ধরেছিল নতুন জুতো কিনে দিতে হবে। আমি তাকে নতুন জুতো কিনে দিলাম। অথচ এখন দেখ, তার জুতোর প্রতি কোন খেয়ালই নেই। জুতো কোথায় ফেলে রেখেছে আর খালি পায়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। হযরত খুব হাসছিলেন। একজন বললেন, অনুমতি পেলে আমি দৌড়ে গিয়ে বাড়ী থেকে মিঁয়া বশীরের জুতো নিয়ে আসি। হযরত বললেন, না, প্রয়োজন নেই। তারা যেমন খেলছে তাদের খেলতে দাও।

একবার হযরত (আঃ)-এর সাথে সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদও মসজিদে এসে গেলেন। কোন কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন। হযরত (আঃ) বললেন,

মিঁয়া মসজিদে হাসতে হয় না। তারপর আবার যখন হাসি আসল মিঁয়া হাসি চেপে বাইরে চলে গেলেন।

হযরত (আঃ)-এর অভ্যাস ছিল, তাঁর কাছে কোন ছেলে আসলে নিজের সাথে জায়গা করে বসতে দিতেন। মিঁয়া মাহমুদ বেশি এবং অন্যরা কম আসতেন। মির্যা মোবারক আহমদ হুযূরের কোলে থাকতেন। পরে কোন ব্যক্তি মির্যা মোবারককে নিজ কোলে নিতেন। আবার যখন সাহেবযাদা পিতার কোলে যেতে আগ্রহ করতেন হযরত (আঃ) নিজের কোলে নিয়ে নিতেন।

একবার হযরত আকদস (আঃ)-এর কাছে সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ আসছিলেন, কাঁদো কাঁদো অবস্থা। কেউ মিঁয়া শরীফকে বলেছে যে, হযরত আকদস তোমাকে বেশি ভালবাসেন না। হযরত চাচ্ছিলেন, মিঁয়া শরীফকে কাছে নিয়ে আদর করতেন। হযরত মিঁয়া শরীফকে নিজের দিকে টেনে নিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মিঁয়া শরীফ বিপরীত দিকে ছুঁটে যেতে চাচ্ছিলেন। কারণ তার নাকে সর্দি বের হচ্ছিলো, কাছে গেলে হযরতের কাপড় খারাপ হয়ে যাবে। হযরত বলছিলেন, আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালবাসি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা হযরত সাহেবকে খুব বিরক্ত করতাম। হযরত যত বড় কাজে ব্যস্ত থাকুন না কেন। যখন তখন আমি গিয়ে হযরতকে বিরক্ত করতাম। গিয়ে বলতাম, আব্বা পয়সা দাও। হযরত অন্য রুমালে বাঁধা পয়সা বের করে দিতেন। কখনও আমরা খুব বেশি বিরক্ত করলে হযরত বলতেন, "মিঁয়া, আমি এখন জরুরী কাজ করছি, বিরক্ত করো না।"

হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা বর্ণিত আছে। হযরত আকদসের একবার খেয়াল হলো যে, মিঁয়া শরীফ যারদা পসন্দ করে না। যখন যারদা পাক হয়ে আসল মিঁয়া শরীফ যারদা নেবার জন্য হাত বাড়ালে হযরত আম্মা জান বললেন, শরীফ যারদা খায় না। হযরত সাহেবও বললেন, শরীফ যারদা খায় না। একথা শুনে মিঁয়া শরীফ বলতে আরম্ভ করলেন, 'শরীফ যারদা খায়। শরীফ যারদা খায়। শরীফ যারদা খায়।'

হযরত মৌলভী আব্দুর রহীম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত আকদস কোন কাজে ব্যস্ত হতেন, কামরার দরজা বন্ধ রাখতেন। কোন শিশু একে ডাকতেন, 'আব্বা দরজা খুল'। হযরত দরজা খুলে দিতেন। ছেলে ভেতরে ঢুকেই আবার বাইরে দৌড় দিতো। হযরত দরজা বন্ধ করে বসতেন। আবার ছেলে এসে ডাকতেন, 'আব্বা দরজা খুল।' হযরত সাহেব আবার দরজা খুলতেন। ছেলে ঘরে ঢুকেই আবার বাইরে দৌড় দিতেন। হযরত আবার দরজা বন্ধ করতেন। একবার আমি অনুমান করলাম, কুড়ি বার এমন দরজা খোলা ও বন্ধ করার ঘটনা ঘটেছে। হযরত সাহেব একটি বারও বিরক্তি প্রকাশ করেন নি।

এক পাঠান পরিবারের মেয়ে ছিলেন, আমাতুল্লাহ্। 'লালপরী' বলে ডাকত সবাই। আফগানিস্তানের খোস্ত এলাকা হতে তার পরিবার কাদিয়ান এসেছিল। হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ (রাঃ)-এর শাহাদতের পরপরই তার পিতাও চাচা সৈয়্যদ নূর ও সৈয়্যদ আহমদ নূর কাদিয়ান এসে গিয়েছেন। তখন লালপরীর বয়স খুব কম ছিল। বাল্যকালে তার চোখে প্রায় অসুখ থাকত। চোখ উঠত। খুব কষ্ট হোত। একবার লালপরী হযরত আকদস (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'হুযূর আমার চোখে খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে।' হযরত সাহেব নিজ মুখের পানি বা থু থু আঙ্গুলে করে লালপরীর চোখে লাগিয়ে দিলেন। এরপর সারা জীবনে লালপরীর চোখে আর কখনও কষ্ট হয় নি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এমন একটি ইলহাম হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) সম্পর্কেও আছে। "বার্‌রাকা তিফ্‌লী বশীর"। আমার ছেলে বশীরের চোখে উজ্জ্বলতা দেয়া হয়েছে। বাল্যকালে খুব কষ্ট ছিল। এরপর আর কখনও কষ্ট হয় নি।

উপরে বর্ণিত লালপরী সম্পর্কে মজার ঘটনা শোনাচ্ছি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) বলতেন, 'যখন আমি তাকে কোন কাজের জন্য ডাকি, প্রথমে সে দ্রুত একটু পেছনে সরে যায় তারপর আবার সামনে এগিয়ে আসে। আমি যদি তাকে যেতে বলি তবে সে দ্রুত সামনে এসে যায়, তারপর পেছনে যায়। অতএব আমি তাকে কাছে ডাকতে হলে পেছনে যেতে বলি, ফলে সে সামনে আসে। আর যদি দূরে যেতে বলা হয় তখন কাছে আসতে বলি ফলে দূরে সরে যায়।"

এবার হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ)-এর বর্ণনা বড়ই মহিমামন্ডিত ঘটনা। মুফতী সাহেবের ৪ বছরের এক সন্তান বধির এবং নির্বাক বা বোবা ছিল। পরবর্তীতে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন এবং গুরুদাসপুরের মামলায় সাথে সাথে আদালতে যেতেন।

একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সেই অসুস্থ শিশুকে দেখে হযরত মুফতী সাহেবকে বললেন, আপনি আদালতে যাবেন না এখানে থাকুন। পরদিন সকালে সেই শিশু মারা গেলেন। হযরত সাহেব গুরুদাসপুর থেকে ফেরত এলে হযরত মুফতী সাহেব তার ছোট মেয়ে হাফিযাকে কোলে করে হযরত সাহেবের সাথে দেখা করতে আসলেন। হযরত সাহেব বললেন, আমি আপনার ছেলের মৃত্যুর খবর শুনেছি। খুব দুঃখিত হয়েছি এবং আপনার জন্য অনেক দোয়া করেছি। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দিবেন। যে সন্তান হবে সে শুনবে এবং কথাও বলবে। মুফতী সাহেব বললেন, আমার ঘরে দুই মেয়ে এবং দুই ছেলে ছিল। এখন দুই মেয়ে আছে। আবার যদি মেয়ে হয় তবে তো ভাল হবে না। ছেলে যদি হয় তবে ভাল মনে করব। হযরত সাহেব হেসে বললেন, 'মিঁয়া! আমাদের খোদার সেই শক্তিও আছে, চাইলে মেয়ে হওয়া বন্ধই হয়ে যাবে।'

আল্লাহ্‌র মহিমা দেখুন! এরপরে মুফতী সাহেবের ঘরে পরপর ৬ জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। সবাই শ্রবণ শক্তি রাখত এবং কথাও বলত। (এমটিএ-হতে সরাসরি ধারণকৃত)

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

(১৬তম কিস্তি)

তৃতীয় অধ্যায়

চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ)

হযরত মসীহ্র ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বপক্ষে এক উচ্চ পর্যায়ের সাক্ষ্য হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্রের শত শত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 'মারহামে ঈসা' নামের একটি মলমের ব্যবস্থা-পত্র বা ফর্মূলা। এটি এমন এক প্রমাণ যা না মানলেই নয়। সকল গ্রন্থের কোন কোনটি খৃষ্টানদের প্রণীত। আবার কোন কোনটির প্রণেতা মাজুসী (পার্সী) অথবা ইহুদী। আর কোন কোনটির লেখক মুসলমান। এবং এ গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ অতি প্রাচীন কালের গবেষণায় জানা যায়। প্রথমতঃ মৌখিকভাবে এ মলম প্রণয়ন পত্রটি মানুষের মাঝে সুখ্যাত হয়ে পড়ে। তারপর মানুষ তা লিপিবদ্ধ করে নেয়। প্রথমে হযরত মসীহ্র যুগেই ক্রুশীয় ঘটনার সামান্য কিছুকাল পর রোমান ভাষায় ঔষধ প্রণয়ন-পত্রের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রণীত হয়। এতে এ মলমের ব্যবস্থা-পত্র বা ফর্মূলাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং এতে বলা হয়েছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষতগুলোর জন্যে এ ব্যবস্থাপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরপর সেই ঔষধ প্রণয়ন পত্রের সংকলন গ্রন্থটির বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অবশেষে মামুন-উর - রশিদের যুগে গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। খোদাতাআলার কুদরতের কী অদ্ভুত মহিমা যে, প্রত্যেক ধর্মের বিজ্ঞ চিকিৎসাবিদ তা তাঁরা খৃষ্টান হোন বা ইহুদী, অগ্নি উপাসক (মাজুসী) হোন বা মুসলমান, সবাই এ মলম-প্রণয়ন পত্রটিকে তাঁদের প্রণীত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর তাঁরা সবাই এ মলমের প্রণয়ন-পত্রটি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্যে তাঁর হাওয়ারীগণ এ প্রস্তুত করেছিলেন। ঔষধ পত্রের মৌলিক উপাদানাদির গুণাগুণ সংক্রান্ত পুস্তকাবলী পাঠে জানা যায়, এ মলম প্রণয়ন-পত্রটি আঘাত বা পতনজনিত ক্ষতে অত্যন্ত কার্যকর। ক্ষত থেকে প্রবাহিত রক্ত তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে এবং এতে মস্তকি (Myrrh) অন্তর্ভুক্ত থাকায় ক্ষত-স্থানকে পচন থেকেও রক্ষা করে। এ ঔষধটি প্লেগেও ফলপ্রদ এবং সব ধরনের ফোঁড়া ও চুলকানিতেও কার্যকর। ক্রুশে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পরে পরে স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঐশীবাণীর সাহায্যে, না কি কোন চিকিৎসাবিদের প্রস্তাবনায় এ মলমটি প্রস্তুত করা হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানা নেই। মলমটির কোন কোন মৌলিক উপাদান, বিশেষতঃ মস্তকি (Myrrh), যার উল্লেখ তওরাতে এসেছে, তা প্রায় অব্যর্থ নিরাময়ের কাজ করে।

মোট কথা, এ ঔষধটি ব্যবহারে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর ক্ষতগুলো কয়েক দিনেই ভাল হয়ে যায় এবং এত শক্তির সঞ্চয় হয় যে, তিনি তিন দিনে জেরুযালিম থেকে গালীলের দিকে সত্তর মাইল পায়ে হেঁটে যান। অতএব এ ঔষধটির কার্যকারিতা ও গুণ সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মসীহ্ তো অন্যদের আরোগ্য করতেন, কিন্তু এ ঔষধটি মসীহ্র আরোগ্য করেছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের যেসব গ্রন্থে এ মলমের ব্যবস্থাপত্রটি লিপিবদ্ধ রয়েছে, সংখ্যায় তা সহস্রাধিক। সেগুলোর ফিরিস্তি লিখতে গেলে তা অনেক দীর্ঘ হবে। আর যেহেতু এ ব্যবস্থা-পত্রটি ইউনানী চিকিৎসাবিদদের মাঝে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, সেহেতু আমি সবগুলো গ্রন্থের নাম লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বলে মনে করি না, কেবল কয়েকটির নাম লিখে দিচ্ছি যা এখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানেও) মজুদ রয়েছে।

'মরহামে ঈসা' মলমটির উল্লেখ সম্বলিত ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর ফিরিস্তি, যেগুলোতে এ-ও উল্লেখ রয়েছে যে, এ মলমটি হযরত ঈসার জন্যে অর্থাৎ তাঁর দেহের ক্ষতগুলোর জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল ঃ

- কানূন ঃ শায়খুর রাঈস বু আলী ইবনে সিনা প্রণীত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩৩।
- শারাহ্ কানূন ঃ আল্লামা কুতবুদ্দিন শিরাযি প্রণীত, ৩য় খন্ড,
- কাসিলুস্ সানাআ' ঃ আলী বিন আল আব্বাস আল মাজূসী (অগ্নি উপাসক), ২য় খন্ড, পৃঃ ৬০২।
- কিতাব মাজ্মূআ' বাকায়ী ঃ মাহ্মুদ মুহাম্মদ ইসমাঈল মুখাতার, খাকানবাসী, পিতার নামানুসারে মুহাম্মদ বাকা খান প্রণীত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯৭।
- কিতাব তায্কিরা এ উলুল আলবাব ঃ শায়খ দাউদ আল যারীর আল্ আনতাকী প্রণীত, পৃঃ ৩০৩
- কারাবাভীন রূমী ঃ হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর কাছাকাছি সময়ে সংকলিত মামুনুর রশিদের সময়ে আরবী ভাষায় অনূদিত (চর্মরোগ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।
- কিতাব উমদাতুল মুহতাজ ঃ আহ্মদ বিন হাসান আল রাশীদী আল্ হাকীম প্রণীত। এ গ্রন্থটিতে মারহামে ঈসা এবং অন্যান্য ঔষধের ফর্মূলা (ব্যবস্থাপত্র) একশ' এরও বেশি সংখ্যক গ্রন্থ থেকে নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এসবই ফ্রেঞ্চ ভাষায় রচিত গ্রন্থ।
- কিতাব কারাবাভীন ফার্সি ঃ মুহাফীম মোহাম্মদ আকবর আরযানী, (চর্মরোগ সংক্রান্ত)।
- কিতাব শিফাউল আসকাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩০।
- কিতাব মিরাইয়াতুশ্ শিফা ঃ হাকীম নায়ু শাহ্ (হস্তলিখিত সংস্করণ) চর্মরোগ বিষয়ে।
- যাখীরা-এ-খুওয়ার্জম শাহী আমরাযে জিলদ।

- শারাহ্ কানূন গীলানী, ৩য় খন্ড।
- শারাহ্ কানূন ফার্সী, ৩য় খন্ড।
- কারাবাভীন আলাভী খান, আমরাযে জিল্‌দ।
- কিতাব এলাজুল আমরায ঃ হাকীম মোহাম্মদ শরীফ খান পৃঃ ৮৯৩।
- কারাবাভীন হউনানী, আমরাযে জিলদ
- তোহফাতুল মু'মিনীন, মাখযানুল আদভিয়া এর টীকায়, পৃষ্ঠা ৭১৩।
- মুহীত ফিত্‌তিব, পৃঃ ৩৬৭।
- কিতাব আকসীর আ'যম, ৪র্থ খন্ড ঃ হাকীম মুহাম্মদ আ'যম্‌খান আল্ মুখাতাব বা নাযেয জাহাঁ প্রণীত পৃঃ ৩৩৯।
- কারাবাভীন মা'সূমী ঃ মা'সূম বিন করীমুদ্দীন আল্ শোস্ত্রী শিরাযী প্রণীত।
- কিতাব উজালা নাফেআ ঃ মুহাম্মদ শরীফ দেহ্‌লভী প্রণীত পৃঃ ৪১০।
- কিতাব তিব্‌বে শিব্‌রী, লওয়ামে' শিবরীয়া নামে প্রসিদ্ধ সৈয়্যদ হুসেন শিব্‌র কাযেমী প্রণীত, পৃঃ ৪৭১।
- কিতাব মাখযানে সোলায়মানী, আকসীর আরাবীর অনুবাদ, অনুবাদক ঃ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন বাহাউলপুরী।
- শিফাউল আমরায ঃ অনুবাদক মাওলানা আল্ হাকীম মোহাম্মদ নূর করীম, পৃঃ ২৮২।
- কিতাবুত্‌তিব দারা শকোহী ঃ নূর উদ্দিন মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম আইনুল মুল্‌ক আলা শিরাযী প্রণীত।
- কিতাব মিনহাজুদ্ দুকান বা দস্তরুল আ'ইয়ান ফী আমাল ওয়া তার্কীবুন্ নাফেয়া লিল আবদান ঃ আফলাতুনে যামানা ও রাঈসে আওয়ানা আবুল মিনা বিন আবু নসর আল আত্তার আল্ ইস্রাঈলী আল্‌হারূনী (অর্থাৎ ইহুদী) পৃঃ ৮৬।
- কিতাব যুদ্ধাতুত্‌তিব্ ঃ সৈয়্যদুল ইমাম আবূ ইব্রাহীম ইসমাঈল বিন হাসান আল্ হুসেনী আলর্জানী প্রণীত, পৃঃ ১৮২।
- তিব্বে আক্‌বর ঃ মুহাম্মদ আকবর আর্যানী প্রণীত, পৃঃ ৫৪২
- কিতাব মীযানুত্‌তিব্ ঃ মুহাম্মদ আকবর আর্যানী প্রণীত পৃঃ ১৫২
- সাদীদী ঃ রাঈসুল মুতাকাল্লেমীন ইমামুল মুহাক্কেকীন আল্ সাদীদ আল্ কাযরূনী, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮৩।
- কিতাব হাভী ঃ কবীর বিন যাকরীয়া প্রণীত (চর্মরোগ বিষয়ে)।
- কারাবাভীন ঃ ইবনে তিলমীয প্রণীত (চর্মরোগ বিষয়ে)
- কারাবাভীন ঃ ইবনে আবি সাদেক প্রণীত (চর্মরোগ বিষয়ে)।

উদাহরণস্বরূপ এ গ্রন্থগুলোর এখানে উল্লেখ করা হলো, বিদ্বান ও শিক্ষিত মানুষ মাত্রই বিশেষতঃ চিকিৎসাবিদগণ জানেন, এ গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই ইসলামের প্রাথমিক যুগে বড় বড় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হতো এবং ইউরোপের শিক্ষার্থীরাও এগুলো পাঠ করতেন। একথা সম্পূর্ণ সত্য এবং এতে অতিশয়োক্তির লেশমাত্র নেই যে, প্রত্যেক শতাব্দীতে প্রায় কোটি কোটি (লোক) সকল গ্রন্থের নাম সম্পর্কে অবগত হয়ে এসেছেন এবং লক্ষ মানুষ এগুলো আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেছেন। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, ইউরোপ ও এশিয়ার জ্ঞানী লোকদের মাঝে (কমপক্ষে হলেও) এ ফিরিস্তিতে লিপিবদ্ধ কোন কোন অতি মহান গ্রন্থের নাম সম্পর্কে অনবহিত এমন একজনও নেই। সে যুগে স্পেন, কাস্টোমনিয়া ও সেন্ট্রিনে যেসব মহা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেগুলোতে ইউরোপের শিক্ষার্থীগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে বু আলী সিনা প্রণীত আল কানূন, যে মহান গ্রন্থটিতে 'মারহামে ঈসা' নামক মলমের প্রণয়ন-পত্র (ফর্মূলা) ও এর তৎপর্যের উল্লেখ রয়েছে এবং বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন শাস্ত্রে প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ, যেমন শিফা, ইমারত ও বিশারত অতি আগ্রহের সাথে অধ্যয়ন করতেন। তেমনি আবূ নসর ফারাবী, আবূ রায়হান, ইস্রাঈল, সাবিত বিন কুর্‌রা, হুনায়ন বিন ইসহাক ও ইসহাক প্রমুখ রয়েছেন। গ্রীক ভাষা থেকে তাঁদের অনূদিত গ্রন্থাদি পড়ানো হতো। নিশ্চয় এ গ্রন্থগুলোর (অনুবাদ) ইউরোপের কোথাও কোথাও এখন মজুদ থাকবে। আর যেহেতু মুসলিম শাসকগণ চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদির উন্নয়নে আগ্রহী ও পৃষ্ঠাপোষক এবং আন্তরিকভাবে প্রয়াসী ছিলেন, সে জন্যে তাঁরা গ্রীক ভাষায় প্রণীত উত্তম গ্রন্থাবলীর (আরবী ভাষায়) অনুবাদ করান এবং দীর্ঘকাল যাবৎ এ সকল বাদশাহ্‌র মাঝে খিলাফত ব্যবস্থা প্রভাবশীল থাকায় তারা রাজ্য বিস্তারের চেয়ে জ্ঞান বিস্তারে অধিক যত্নবান ছিলেন। এসব কারণেই তারা গ্রীক ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির আরবী ভাষায় তরজমা করান, কেবল তা-ই নয়, বরং ভারতবর্ষ থেকে বিজ্ঞ ও সুদক্ষ পন্ডিতদেরকেও তলব করে বড় বড় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির বিভিন্ন শাখার গ্রন্থাদিরও অনুবাদ করান। অতএব সত্যান্বেষীদের প্রতি তাঁদের (অর্থাৎ উক্ত মুসলিম শাসকদের) এটা এক বিশেষ অনুগ্রহ ও অবদান যে, তাঁরা রোমান ও গ্রীক ইত্যাদি ভাষায় প্রণীত চিকিৎসাশাস্ত্রের সেসব (প্রাচীন) গ্রন্থের অনুবাদ করান, যেগুলোতে মরহামে ঈসা সংক্রান্ত ব্যবস্থা-পত্র লিপিবদ্ধ ছিল, আর এ সম্পর্কে স্পষ্ট ফলকের ন্যায় লেখা ছিল যে, এ মলম হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষত নিরাময়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ ইসলামী যুগের বিজ্ঞ পন্ডিতবর্গ, যেমন সাবেত বিন কুর্‌রা ও হুনায়ন বিন ইসহাক প্রমুখ চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন ছাড়া গ্রীক ভাষায়ও বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তারা মরহুমে ঈসার বর্ণনা সম্বলিত কারাভীনের (ঔষধ প্রণয়ন প্রণালী সংক্রান্ত সংকলন গ্রন্থ) আরবী ভাষায় তরজমা করতে গিয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে গ্রীক ভাষার 'শেলীখা' শব্দটি হুবহু লিখে দেন যাতে এ ইঙ্গিত বহন করে যে, এ গ্রন্থটি গ্রীক গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এ কারণে প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থে 'শেন্দীখা' শব্দটি দেখতে পাবেন। (চলবে)

অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

(৫ম কিস্তি)

বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল

বিভিন্ন নিসাব সম্বলিত সম্পদ

কারও কাছে যদি বিভিন্ন রকমের পৃথক পৃথক যাকাতের নিসাবসম্বলিত সম্পদ থাকে কিন্তু ওগুলোর কোনটাই স্বয়ং নিসাব পরিমাণ নয় বরং কম; এমনকি সবগুলোর সম্মিলিত মূল্য হাজার টাকায় পৌছালেও যাকাত অবশ্য-দেয় হবে না। যেমন কারো নিকট ৪টি উট, ২৯টি গাভী, ৩৯টি ছাগল, ৫১ তোলা রূপা আছে। এক্ষেত্রে কোনটির ওপরই যাকাত দেয় হবে না। আর সম্মিলিত মূল্যের ভিত্তিতেও যাকাত আদায় করা যাবে না। কেননা, এর মাঝে প্রত্যেক সম্পদের যাকাতের নিসাব আলাদা আলাদা আর তা এ সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত।

'বছর' বলতে কী বুঝায় ?

যাকাত অবশ্য-দেয় হওয়ার জন্যে 'বছর' বলতে চান্দ্র বছর বুঝায়। কিন্তু বছরের আরম্ভ বলতে মুহার্‌রম মাস বুঝাবে না বরং যে মাসে নিসাবের সমান কোন সম্পদ মালিকের কর্তৃত্ব, কব্জা ও অধীনে আসবে সেই সম্পদের জন্যে সেই মাস থেকে বছর আরম্ভ হবে। আর ১২টি চান্দ্র মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই সম্পদের যাকাত ধার্য হবে। বছর শেষ হওয়ার আগেই যদি সম্পদের রকম-ফের হয় তাহলে বছরও বদলে যাবে। অর্থাৎ বছর সেই মাস থেকে আরম্ভ হবে যে মাসে এ নতুন সম্পদ কব্জা ও অধীনে আসে। যেমন এক ব্যক্তির নিকট রবিউল আওওয়াল মাসে ১০ হাজার টাকা আসে। ৬ মাস গত হওয়ার পরে অর্থাৎ শা'বান মাসে তিনি ১০ হাজার টাকার গবাদি পশু কিনেন, এক্ষেত্রে এ সম্পদের ওপরে যাকাতের উদ্দেশ্যে বছরের গণনা শা'বান মাস থেকে শুরু হবে। এ গবাদি পশু যদি সারা বছর অর্থাৎ পরবর্তী রজব মাস পর্যন্ত তার নিকট থাকে তাহলে এগুলোর ওপরে যাকাত দেয়া অবশ্য - কর্তব্য হবে। আর বছর শেষ হওয়ার আগেই যদি তিনি গবাদি পশুগুলো বিক্রী করে দেন আর সেই টাকা দিয়ে ব্যবসায়ের নিয়্যতে বাসন-কোসন ক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে বছর সেই মাস থেকে গণনা আরম্ভ হবে যে মাসে তিনি বাসন-কোসন ক্রয় করেছেন।

এভাবে বছরের মাঝামাঝি যদি সম্পদের রকম ফের হয় এবং একটি বছর শেষ না হতে পারে সেক্ষেত্রে সেই মূলধনের ওপর যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে না।

ধন-সম্পদের ওপরে যাকাতের একটি উদ্দেশ্য এটাও যে, মুজদদারী এবং মালামাল জমা করে ও সংকট সৃষ্টি করে বিক্রীর লালসা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। আর মালামাল তরিৎ সরবরাহ করার ও বিক্রী করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

কারও কব্জায় যদি নিসাব পরিমাণ বা এথেকে বেশি কোন সম্পদ থাকে এবং বছরের মাঝামাঝি নিসাব থেকে কমে যায় কিন্তু বছরের শেষে নিসাবের সমান বা এথেকে বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে চলতি বছরে যাকাত অবশ্য-দেয় -এর ব্যাপারে কোন তারতম্য হবে না। আর বছরের শেষে কতটা সম্পদ মজুদ থাকে এর ওপরে যাকাত ধার্য হবে।

বছরের মাঝামাঝি যদি মালামাল হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায়, কেউ ছিনিয়ে নেয় বা অন্য আর কোনভাবে মালিকের কব্জা ও অধীন থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু বছর শেষ হওয়ার আগেই সেই মালামাল পাওয়া যায় তাহলে সেই মালামালের ওপরে যাকাত দিতে হবে। অবশ্য কয়েক বছর ধরে যদি সেই মালামাল মালিক না পায় অথবা সে কাউকে কর্জ দিয়েছে, বা অলংকার বা গবাদি পশু কারও নিকট বন্ধক রাখা হয়েছে অথবা দোকানদারের টাকা খরিদ্দারের জিম্মায় থাকে তাহলে এসব ক্ষেত্রে কেবল সেই বছরই যাকাত ধার্য হবে যে বছর এ মালামাল দ্বিতীয়বার তার কব্জা বা অধীনে এসেছে।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন, ব্যবসায়ের যে মালামাল ক্রেতার কাছে পড়ে থাকে। এর ব্যাপারে যাকাতের আদেশ কী? এর ওপরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"যে মালামাল দোদুল্যমান এর যাকাত নেই, যতক্ষণ মালামাল নিজ দখলে না আসে। ব্যবসায়ীরা নানা প্রকার বৃথা বাহানা প্রভৃতি করে যাকাত থেকে রেহাই পেতে চায়। পরিশেষে তার সামর্থ্যানুযায়ী নিজের খরচও এ মালামাল থেকে বরদাশ্‌ত করা হয়ে থাকে। তাকওয়ার সাথে নিজের বর্তমান ধন-সম্পদ ও দোদুল্যমান মালামালের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং সমীচীন মনে করে খোদাতাআলাকে খুশী করতে যাবে। কোন কোন লোক খোদাতাআলার সাথেও নানা প্রকার বাহানা করতে থাকে, এটা ঠিক নয় (মজমুআ ফাতওয়া আহমদীয়া, জিলদ, ১ পৃষ্ঠা ১২৮)।

নাবালক বা পাগলের ধন-সম্পদ

নাবালক বা পাগলদের অধিকার স্বত্বে যে ধন-সম্পদ রয়েছে যদি তা নিরাপদ ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার সুযোগ থাকে আর বিশ্বস্ততার ওপরে এ ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক তা ব্যবসায়ে লাগিয়ে দেয় তাহলে নিয়মানুযায়ী যাকাত দেয়া আবশ্যকীয় হবে। নচেৎ যাকাত আবশকীয় হবে না। কেননা, এমন পরিস্থিতিতে যাকাত ধার্য হলে মূলধনের সবটা এতে খরচ হয়ে যাবে। আর নাবালকের কল্যাণের খাতিরে ধন-সম্পদ জমা রাখার উদ্দেশ্যই মাঠে মারা যাবে।

ফতওয়া

যাকাত কী?

যাকাত কী? **ইউয়াখাযু মিনাল উমারাই ওয়া ইউরাদ্দু ইলাল ফুক্বারাই'** অর্থাৎ সেই ধন-সম্পদ যা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেয়া হয়। এতে উচ্চ মার্গের সহানুভূতি শিখানো হয়েছে। এভাবে উঁচু ও নীচুর পারস্পরিক মিশ্রণের ফলে মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা ভাল হয়ে যায়। ধনীদের ওপর এটা আদায় করা অবশ্য-কর্তব্য। ফরয যদি না-ও হতো তাহলেও মানবিক সহানুভূতির চাহিদা থাকতো যে, গরীবদের সাহায্য করা হয়। কিন্তু এখন আমি দেখছি, প্রতিবেশী যদি অভুক্ত মারা যায় তাহলেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, নিজের আরাম-আয়েশের কাজে ব্যস্ত থাকে। যে বিষয় খোদা আমার প্রাণে জাগ্রত করেছেন আমি তা বর্ণনা করতে ক্ষান্ত হতে পারি না। মানুষের মাঝে সহানুভূতি একটি উচ্চ মার্গের গুণ। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ

অর্থাৎ তোমরা কখনও সেই পুণ্য লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা নিজেদের প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না কর (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৩)। আল্লাহ্‌তাআলাকে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি এটা নয় যেমন, কোন হিন্দুর গাভী রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে সে বলে, বেশ, এটাকে (দেবতার নামে) মানত করে দেই (অর্থাৎ সদকা দিয়ে দেয়)।

অনেক লোক এমনও হয়ে থাকে বাসি-পচা রুটি যা কোন কাজে লাগে না তা ভিক্ষুককে দিয়ে দেয় আর মনে করে, আমরা দান-খয়রাত করেছি। এমন দান আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় নয়। আর এমন খয়রাত গ্রহণীয় হতেই পারে না। তিনি তো পরিষ্কার বলেছেন-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ

(৩ঃ৯৩)

আসল কথা হলো, কোন পুণ্য তখন পর্যন্ত পুণ্য হতে পারে না যতক্ষণ নিজের প্রিয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌তাআলার পথে, তাঁর ধর্মের প্রচারের জন্যে এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবার জন্যে ব্যয় না করা হয় [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)]

ফিকাহ্ আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৮)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

নেযামে জামাত ও কর্ম-কর্তাদের করণীয়

[সৈয়্যদনা ও ইমামানা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৬ ডিসেম্বর, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ বাইতুল ফুতূহ্ লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহহুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহার পরে সূরা আলে ইমরান-এর ১৬০ আয়াত পড়ে হুযুর বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেযাম [ব্যবস্থাপনা] এমন এক নেযাম বা প্রতেক আহমদীকে বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্নেহ, মমতা ও ভালবাসার একটি বন্ধনে সুন্দর করে বেঁধে রাখে। শিশু-সন্তান যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হয় তখন তাকে এ নেযামের একটি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়। পুত্র সন্তান যদি হয় তাকে মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য করা হয়। কন্যা সন্তান হলে নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্য করা হয়। সেখানে তাদেরকে টীম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করার তরবিয়ত দেয়া হয়। এরপর তাদের থেকে কোন কোন জনকে (আতফালুল আহমদীয়ার) সায়েক বানিয়ে তাদেরকে নিজ ওহ্দাদারদের (কর্মকর্তাদের) প্রতি আনুগত্য করার শিক্ষা দেয়া হয়। পরে যখন তারা পনর বছর বয়সের হয়ে যায়, ছেলেরা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আর মেয়েরা লাজনা ইমাইল্লাহ্র সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে ছেলেমেয়েরা সাংগঠনিক কর্মকান্ডের মাঝ দিয়ে তরবিয়ত পেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় এবং জামাতী নেযাম এবং এর কর্মকান্ড সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা জামাতী নেযামের কার্যক্রম এবং পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে থাকে।

পনর বছর বয়সের পরে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া অথবা লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্য হয়ে নিজেদের সংগঠনের জন্য নিজেদের মাঝ থেকে ওহ্দাদার (কর্মকর্তা) নির্বাচন করতে পারে। এভাবে তারা সংগঠনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন প্রকার

তরবিয়তি বিষয়াদি সম্পাদন করতে শিখে। কেন্দ্রীয় নির্দেশনাবলীর উপর আমল করতে থাকে। এভাবে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাল্যকাল থেকেই সংগঠনের মাধ্যমে এ ধরনের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ট্রেনিং পেতে থাকে। এরপর তারা যখন আরো বড় হয়ে যায় তখন জামাতী নেযামের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। এরা তখন জামাতী নেযামের কর্মকান্ডে বেশি উপযুক্ত হয়ে বেশি সহযোগিতার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং জামাতের মাঝে কার্যকর ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

এভাবে অংগ-সংগঠনের মাধ্যমে তরবিয়ত পেয়ে আমাদের আবাল বৃদ্ধ-বণিতা বড় হয়ে জামাতী নেযামের অংশ হয়ে যায় যদিও জামাতী নেযামই আসল ও মূখ্য; কিন্তু অল্প বয়সে তারা জামাতী নেযামের অংশীদার হওয়ার ততটা সুযোগ পায় না যতটা অঙ্গ-সংগঠনের মাঝে সুযোগ পায়। অল্প বয়সে সেটা সম্ভবও নয়। এ জন্যই হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) আমাদের অঙ্গ-সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জামাতের জন্য হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর এটি একটি বিরাট অবদান, বড়ই অনুগ্রহ। এ কারণে প্রত্যেক আহমদী ছেলে-মেয়ে বড় হতে না হতেই তার অন্তরে জামাতী নেযামের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। নেযামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিয়েই তারা বড় হতে থাকে। বাল্যকাল থেকেই যেহেতু একটি ছেলে বা মেয়ে জামাতের মাঝে, স্নেহ-মমতা, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে নেযামের মাঝে মিলেমিশে কাজ করার আবেগ-অনুভূতি নিয়ে বড় হয়, যুগ-খলীফার সাথে পদে পদে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক, ভালবাসার সম্পর্ক কায়েম হতে থাকে- তাই তো প্রত্যেক আহমদী জামাতী কাজে যখন অংশ গ্রহণ করে তখন সে নিজ আনন্দের সাথে ওহ্দাদারের (কর্মকর্তাদের) আনুগত্য করে। বাল্যকাল থেকে এমন পরিবেশে সে বড় হয়েছে, এমন শিক্ষা সে পেয়েছে। যুগ-খলীফার সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার কারণে সে এমন না করে পারে না। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেযাম একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আল্লাহ্র ফযলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যুগ-খলীফার দৃষ্টি সরাসরি সবার উপরে থাকে। এ কারণেই নব-দীক্ষিতরাও খুব শীঘ্রই এ নেযামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

জামাত যত বেশি বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে, ব্যাপকতা লাভ করে চলেছে, জামাতের নেযামের পরিচালকদের, কর্মকর্তা বা কর্মীবৃন্দের দায়িত্ব তত বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। তওবা ইস্তিগফার করা তাদের জন্য বেশি জরুরী হয়ে পড়েছে। যেমন (সূরা নাসর এ) **ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা**-নির্দেশ এর প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে হবে। এ বিষয়টি আজ খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। সাথে সাথে তাদের স্বভাব তাদের আচরণে নম্রতা ও মাধুর্য সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়ার দিকে বার বার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। জামাতী নেযামের কোন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিজের আমিত্ব, নিজের অহমিকাকেও নিজের খেয়াল-খুশীকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে খেদমত করার প্রতি বেশি নজর দিতে হবে। আগের চেয়ে এখন এর বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ছোট ছোট কথার উপর রাগান্বিত

হবার স্বভাব পরিবর্তন করতে হবে, করা উচিত। জামাতের ভাইদের সাথে স্নেহ-মমতা ভালবাসার সম্পর্ক গড়তে হবে। তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। তাদের জন্য দোয়ার অভ্যাসকে গড়তে হবে। তবে মনে করা যেতে পারে যে, ওহ্‌দাদারগণ (আমেলার সদস্যগণ) নিজের দায়িত্ব পালন করছেন বা কমপক্ষে পালনের চেষ্টা করছেন। আহমদী জামাতের ওহ্‌দাদার (আমেলার সদস্য) মঞ্চে বসার জন্য অথবা অহংকারের সাথে চলাফেরা করার জন্য নির্বাচন করা হয় নি বরং এ জন্য তাদের নির্বাচন করা হয় যে, তারা জামাতের তথা জাতির খেদমত করবেন। যেমন বলা হয়েছে 'জামাতের নেতারা জামাতের সেবক হয়ে থাকেন।'

জামাতকে একত্র রাখার, ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌তাআলা দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন, আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি এখানে তা বলা হয়েছে।

"বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পরম রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি সদয়চিত্ত হয়েছ, তুমি যদি রুক্ষ এবং কঠোর-চিত্ত হতে তাহলে তারা নিশ্চয় তোমার চারপাশ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ত। অতএব তুমি তাদের মার্জনা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (শাসন) কার্যের বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলগণকে পসন্দ করেন (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০)।

আঁ হযরত (সঃ)-এর অন্তরে মানব জাতির জন্য স্নেহ-মমতা-ভালবাসা ছিল। নম্রতা ছিল বলেই মানুষ তাঁর (সঃ) কাছে আসত। এমতাবস্থায় আমি বা আপনি কে যে মানুষের জন্য ভালবাসা ও স্নেহভরা আচরণ করব না? আর আশা করব যে, মানুষ আমাদের সকল আদেশ মানবে? আমাদের তো কর্তব্য এই যে, আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-এর অনুসরণে অনেক বেশি করে বিনয়ের সাথে, নিজেদের তুচ্ছ করে মানুষের প্রতি আমরা স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা প্রদর্শন করি।

বাস্তবে আজ যুগ-খলীফার জন্য স্বয়ং প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক শহরে গিয়ে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া বড় কঠিন বিষয়। এ জন্য জামাতের নেযাম কায়েম আছে এবং আল্লাহ্‌র ফযলে এ নেযাম আজ বড় দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকল স্তরের ওহ্‌দাদারগণ (আমেলার সদস্যগণ) অংগ সংগঠনের ওহ্‌দাদার হন বা জামাতের ওহ্‌দাদার হন সবাই যুগ-খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত আছেন। তাদের কাছে এমনটাই আশা করা হয়। এটা মনে করা হয় যে, তারা যুগ-খলীফার প্রতিনিধি। তারা যদি নিজ নিজ অঞ্চলে নিজ নিজ আওতাধীন জামাতের আহমদীদের দায়িত্ব পালন না করেন; তাদের ভালমন্দ সুখ-দুঃখে তাদের সাথে শরীক না হন - তাদের সাথে স্নেহ ভালবাসার আচরণ না করেন। অথবা খলীফা কারো সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে চেয়েছেন- বিনা বিচারে যাচাই না করে রিপোর্ট দিয়ে দেন, অথবা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে (আল্লাহ্ না করুন কারো মাঝে যেন এমন না হয়ে থাকে) ভুল রিপোর্ট দিয়ে দেন, তাহলে এমন ওহ্‌দারগণ সবাই পাপ বা গুনাহ্ কর্মে লিপ্ত হয়েছেন।

কিছুদিন পূর্বে কোন এক জামাতের কয়েক ব্যক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রে রিপোর্ট এসেছিল যে, এরা জামাতের শিক্ষার বিপরীত অমুক অমুক কাজ করেছে। জামাতের বিধান মতে সেগুলোর কমপক্ষে শাস্তি ছিল নেযাম জামাত থেকে তাদের বহিষ্কার করা। মরকেযী দফতর থেকে আমার কাছে রিপোর্ট এসেছিল এবং বিধান মতে তাদের শাস্তি হয়ে গেছে। যাদের শাস্তি দেয়া হয়েছিল তারা খবর পেয়ে চিৎকার করল যে, এ ধরনের কর্মকান্ডের সাথে তো আমাদের কোন প্রকার সংস্রব নেই। তখন মরকয থেকে কমিশন নিযুক্ত করে পুরো ব্যাপারটা তদন্ত ও অনুসন্ধান করা হলে দেখা গেল যে, সেই জামাতের প্রেসিডেন্ট বিষয়টি ঠিক তদন্ত না করেই রিপোর্ট করেছিলেন মরকযে এখন প্রেসিডেন্ট বলছেন, ভুলে নাম মরকেযে চলে গেছে। এটা কি শিশুদের খেলাধূলার বিষয়? কয়েকজন নির্দোষ ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়ে বলে দেয়া হোল যে, ভুলে নাম চলে গেছে। এমন দায়িত্বহীন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি বলেছি, অনতিবিলম্বে যেন তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। আগামীতে যদি কেউ এমন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয় তাকে জীবন ভর আর কখনও কোন জামাতী ওহ্‌দা (পদ) দেয়া হবে না। এ ব্যক্তি আমাদেরকেও পাপে শামিল করেছে। (আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন) হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

হযরত মাকর বিন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ্‌তাআলা যে ব্যক্তিকে মানুষের উপর নেগরান এবং দায়িত্ববান বানিয়েছেন সে যদি মানুষের ভালমন্দ দেখা শোনা করতে এবং তাদের মঙ্গলের চেষ্টায় নিজের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তাহলে সে মারা গেলে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করবেন এবং জান্নাতে স্থান দিবেন না।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ নিগরান (অভিভাবক) বানিয়েছেন এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমীরও নেগরান (জামাতের উপর), প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ গৃহের নেগরান, স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের নেগরান, সন্তানদের উপর নেগরান। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই নেগরান এবং প্রত্যেককে তাঁর যেরে নেগরানী (ছায়াতলের) লোকদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে।"

আমাদের মজলিসে আমাদের মেম্বারগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেগরান নির্বাচিত হয়েছেন। আমি পূর্বেও অংগসংগঠনগুলোর কথা বলেছি। অনেক ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকেও কোন কোন রিপোর্ট মরকযে এসে থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নেগরানীর উপরোল্লিখিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন হওয়া চাই। নচেৎ আঁ হযরত (সঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন। নেগরানগণ সঠিক দায়িত্ব যদি পালন না করে তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার মাঝেও একটি ভয়ের কারণ আছে। সাধারণভাবে জিজ্ঞেস নয় বরং বলা হয়েছে অবহেলাকারী নেগরানের জন্য জান্নাত হারাম করে দেয়া হবে। অতএব এটি অনেক বড় সতর্কীকরণ, বড় ভয়ের বিষয়। চিন্তা করলে শরীর কেঁপে উঠে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের প্রত্যেক ওহ্‌দাদারকে নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের তৌফীক (সুযোগ) দান করুন।

এটিও বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা, বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন সবাই, মজলিসে আমেলা, তা অঙ্গ-সংগঠনের মজলিসে আমেলা হোক, লাজনা, খোদ্দাম, আনসার বা জামাতের মজলিসে আমেলা হোক, যে কোন আমেলার মিটিং-এ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যখন কোন মন্তব্য বা রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয় তখন যেন খুব চিন্তা-ভাবনা করা হয়, তাড়াহুড়া করা না হয়, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন চিন্তা-ভাবনা করা হয় সে ব্যক্তির চরিত্র যেমনই হোক না কেন, পূর্বের তার কার্যকলাপ যেমনই হোক না কেন তাড়াহুড়া করে যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হয় যে, এ তো অতীতেও এমন এমন করেছে। অতএব তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছে তা ঠিক হবারই কথা। সুতরাং তার বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করা হোক। এমন করা ঠিক হবে না। যে যেমনই হোক তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ যথাযথভাবে তদন্ত করে দেখতে হবে। কোন প্রকারের সন্দেহাবশত যদিও সুযোগ দেয়া সম্ভব হয় তাহলে তাকে তা দেয়া উচিত। নিয়ম বা বিধান এই যে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের ক্ষেত্রে তাকে সন্দেহাবকাশ দিতে হয়। (অর্থাৎ তাকে শাস্তি না দেয়ার কোন অজুহাত পাওয়া গেলে তার ভিত্তিতে শাস্তি না দেয়া) সে যদি অপরাধী হয়েও থাকে এবং এভাবে সে ছাড়া পেয়ে যায় তাহলে হয়ত তার বোধোদয় ঘটতে পারে যে, আমি অপরাধ করেছিলাম কিন্তু সন্দেহের সুযোগে আমাকে শাস্তি দেয়া হয় নি। এরপর সে হয়ত ভাল হয়ে যাবে। না-ও যদি হয় তবুও আমেলার মেম্বারগণ আঁ হযরত (সঃ)-এর একটি হাদীসের উপর আমল করার সুযোগ পাবেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'মুসলমানকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা কর। কোন সুযোগ যদি পাওয়া যায় তাহলে তাকে শাস্তি না দেয়ার সুযোগ অনুসন্ধান কর, কোনভাবে সমস্যার সমাধান কর। **ইমাম বা আমীর বা ব্যবস্থাপকের পক্ষ থেকে ভুল করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার চেয়ে ভুল করে অপরাধীকে শাস্তি না দেয়া শ্রেয়।**"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের কওমী বা জামাতী বিষয়ের উপর দায়িত্ববান বা কর্তব্যরত আল্লাহ্ তার অভাব-অভিযোগ ততক্ষণ দূর করবেন না যতক্ষণ সে জামাতের লোকদের প্রতি আরোপিত দায়িত্ব পালন না করে।"

এখানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, ওহ্দাদার হওয়ার কারণে আপনাদের উপর বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। অনেক বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এমন মনে করা উচিত নয়, ওহ্দাদার হয়ে আমেলার মিটিং-এ কথাবার্তা বললেই দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। প্রত্যেক ওহ্দাদার তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে বাধ্য বা দায়বদ্ধ। যেমন ধরুন, যে সেক্রেটারী উমুরে আমা তার কাজ কেবল এতটুকুই নয় যে, কোন বিতর্ক, বিবাদ বা ঝগড়া-মীমাংসার জন্য এসেছে তিনি মীমাংসা করে দিলেন। আর ব্যাস। অথবা কারো শরীয়ত বিরোধী কার্যক্রমের রিপোর্ট মরকযে করে দিলেন। বরং জামাতের অনেক বেকার যুবক আছে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য চেষ্টা করা তারই কাজ। তাদের রোজগার বা কর্মস্থানের চেষ্টায় তাদের সাহায্য করা। অনেকে ব্যবসায়ী মনমানসিকতার অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের তালিকা প্রস্তুত করবেন। তাদের মাঝে যোগ্যতা আছে বলে যদি মনে হয়, পুঁজিস্বরূপ সামান্য অর্থ সাহায্য দেয়া হলে তারা যদি ব্যবসায় করতে পারবে বলে আশা করা যায়, তাহলে তাদেরকে সামান্য অর্থ সাহায্য দিয়ে ব্যবসায় শুরু করানো যেতে পারে। তারা যদি যোগ্যতার পরিচয় দেয় তাহলে তাদের ব্যবসায় দাঁড়িয়ে যাবে। আমি অনেককে দেখেছি, তারা ফেরী করে কত সামান্য পণ্য বিক্রয় করেছে অথবা কোথাও রাস্তার পাশে বসে কয়েকটা কাপড় বিক্রি করেছে এখন তারা বড় দোকানদার হয়ে গেছেন। এভাবে মানুষকে কোন কাজে লাগবার জন্য উৎসাহিত করা, কাজে লাগিয়ে দেয়া, এটাও জামাতের নেযামের কোন ওহ্দাদার যেমন সেক্রেটারী উমুরে আমারই কাজ।

তারপর সেক্রেটারী তা'লীম। সাধারণভাবে আমাদের জামাতগুলোতে সেক্রেটারী তা'লীমরা ততটা কর্মতৎপর নয় যতটা তাদের কাছে আশা করা হয়েছে। আমি অনুমানের কথা বলছি না। সকল জামাতে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুন। অনেক জামাতে সেক্রেটারীদের অনেকেই সারা বছরে কোন কাজ করেন না অথচ সকলেরই কিছু কাজ তো করা উচিত। যেমন আমি সেক্রেটারী তা'লীমের কথা বলছি। যারা স্কুলে যাচ্ছে জামাতের এসব ছেলেমেয়েদের তালিকা প্রস্তুত থাকা উচিত। আর যারা স্কুলে যাবার বয়স হয়েছে কিন্তু স্কুলে যাচ্ছে না-এর কারণ কি, কেন তারা স্কুলে যাচ্ছে না খোঁজ করে দেখতে হবে। আর্থিক অসংগতির কারণে না কি কেবল গাফিলতির কারণে। আহমদী শিশুদেরকে বুঝাতে হবে, তাদের সময় যেন নষ্ট না হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) শর্ত দিয়েছিলেন প্রত্যেক আহমদী ছেলেমেয়েকে কমপক্ষে হলেও ম্যাট্রিক পাশ করতেই হবে। এখন তো মান উঁচু হয়েছে। আমি বলব, এখন কমপক্ষে ইন্টারমিডিয়েট (পাকিস্তানের) হতে হবে। হিন্দুস্তানে বাংলাদেশে সবদেশেই একটি নিম্নতম মান আছে। (বাংলাদেশে এইচ, এস, সি) আফ্রিকার দেশগুলোতে একটি নিম্নতম মান আছে। ইউরোপেও আমি দেখেছি অনেকেই তাড়াতাড়ি পড়াশুনা শেষ করে দেয়। কিন্তু নিম্নতম মান (এইচ, এস, সি) অর্জন করা উচিত। এখানে তো শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। এখানে বেশি পড়াশুনা করানো উচিত। সেক্রেটারী তা'লীমগণের কাজ ছেলে মেয়েদের বুঝিয়ে বলতে হবে, উচ্চ শিক্ষা অর্জন কর।

আমি আগেও বলেছি, কেউ যদি আর্থিক সংকটের কারণে পড়াশুনা চালাতে পারে না তাহলো তাদের জামাতকে বলা উচিত। ইনশাআল্লাহ্ জামাত তাদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হ্যাঁ, অনেক সময় এমনও হয় কেউ কেউ স্কুল-কলেজের পড়াশুনা করতে চায় না। তাদেরকে বলতে হবে, তারা যেন কোন টেকনিক্যাল লাইনে ট্রেনিং গ্রহণ করে। কেননা আহমদী ছেলের সময় যেন নষ্ট না হয়। এরপর যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে চায় তাদের তালিকা প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে চায় তাদের কী ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন। আর্থিক অনটন আছে কিনা। যতদূর সম্ভব জামাত সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে। কিন্তু সেক্রেটারী তা'লীমকে সক্রিয় হতে হবে।

সেক্রেটারী তা'লীমের আরো কাজ আছে। আমি এখানে দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গ্রাম বা মহল্লা পর্যায় থেকে ন্যাশনাল পর্যায় পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সেক্রেটারী তা'লীম যদি সক্রিয় হয়ে যান, কাজ করেন তাহলে অনেক কাজ আছে।

এরপর সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদ আছেন। এ বিভাগকেও অনেক কর্মবহুল বা সক্রিয়া হবার প্রয়োজন আছে। সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদ বা সেক্রেটারী তরবিয়ত সকলে যদি সক্রিয় হন তাহলে কাজে অগ্রগতি হবে। সেক্রেটারী উমুরে আমার কাজও সহজ হয়ে যাবে। তা'লীম বিভাগেরও সহযোগিতা হবে। রিশ্‌তানাতার কাজও সহজ হয়ে যাবে। এসব বিভাগ এত কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত যে, সেক্রেটারী তরবিয়ত বা ইসলাহ্ ও ইরশাদ সক্রিয় হলে অনেক কাজ হয়ে যাবে। জামাতের আধ্যাত্মিক উন্নতিও হবে। হাদীসে যে কথা বলা হয়েছে যে, মানুষের জন্য কাজ কর। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক বিভাগ তার কাজ করবে।

এভাবে যখন প্রত্যেক ওহ্‌দাদার (আমেলা মেম্বার) নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবেন তখন মানুষের অন্তরে আপনাদের জন্য সম্মান সৃষ্টি হবে। জামাতের মানও উন্নত হবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ পৃথিবীতে উত্তম সংস্কারক তাকেই বলা হয় যিনি তার অনুসারীদের তরবিয়ত করার সাথে সাথে তাদের মাঝে এমন উৎসাহ সৃষ্টি করেন যাতে নেযামের আদেশ মান্য করা তাদের জন্য সহজ হয়। আদেশ মানতে তাদের অন্তরে কোন বাধা-বিপত্তি অনুভব করে না। এ কারণেই কুরআন মজীদ অন্যান্য ঐশী কিতাবের চেয়ে বেশি মূল্যবান। অন্যান্য ঐশী কিতাব বিভিন্ন কাজের কেবল আদেশ দেয়। কিন্তু কুরআন কেবল আদেশই দেয় না, বরং এ কথাও বলে যে, এ কাজ এজন্য কর। সেই কাজ করার জন্য আগ্রহ্ ও উৎসাহ সৃষ্টি করে দেয়। জামাতের মানুষকে বুঝানো এবং বুঝিয়ে তাদেরকে উন্নতির ময়দানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটি সাফল্যের একটি বড় মন্ত্র। কুরআনে এ বিষয়ে বিশেষ তাকিদ করা হয়েছে। সূরা লুকমান-এ পুত্রকে সম্বোধন করে যেসব নসীহত করা হয়েছে এতে নসীহতও আছে **ওয়াকসিদ ফী মাশ্‌য়িকা ওয়াগযুয্ মিনসাউতিকা**- তোমাদের সাথে অনেক দুর্বল মানুষও থাকবে। অতএব তুমি সামনে এগিয়ে যাও কিন্তু এমন (মধ্যম) গতিতে চলবে যেন দুর্বলরা পেছনে পড়ে না যায়। তোমরা এগিয়ে যাও কিন্তু এত দ্রুত যেও না যে, দুর্বলরা পেছনে পড়ে যায়। তারপর যখন অন্যদেরকে কোন আদেশ দাও তাদেরকে বুঝিয়ে দাও। কেবল এরকম বলবে যে, 'আমি যা বলছি তা কর।' কুরআন শরীফের শিক্ষা এ ভালবাসার সাথে সুন্দর করে বল যে, এ রকম করবেন। কেবল কড়া নির্দেশ কর্কশ ভাষায় দিও না। এমন সুন্দর করে বল যে, যাদের বলা হয় তারা যেন বুঝতে পারে এবং তারা বলে যে, হ্যাঁ এ কথা তো আমাদের ভালর জন্যই বলা হয়েছে। ওয়াগযুয্ মিন সওতিকা-এর এটাই অর্থ।

সুতরাং মধ্যম পন্থা ও হিকমতপূর্ণ কথাবার্তা এ দু'টির সমন্বয় জামাত বা জাতির মাঝে উন্নতির রূহ্ (আত্মা) সৃষ্টি করে। হিকমতপূর্ণ কথার উত্তম পদ্ধতি এই যে, অন্যদের মাঝে এমন রূহ্ (আত্মা) সৃষ্টি করে দেয়া যাতে তাদেরকে কোন আদেশ দেয়া হলে তারা বলে উঠে, "আমাদেরও তো এমনই ইচ্ছা হচ্ছিল"। এটাই সেই সময় যখন কোন জাতি উন্নতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে।"

আরো কয়েকটি অভিযোগ যা বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সময় এসে যায়। "আমরা পরিস্থিতির কারণে একটি বিষয়ে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত দিয়েছিলাম। সে দরখাস্ত মরকয থেকে তদন্তের জন্য এবং সুপারিশের জন্য স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে এসেছিল। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব খুব রাগান্বিত হলেন, কেন আমরা সরাসরি কেন্দ্রে (মরকযে) দরখাস্ত দিয়েছি। তার মাধ্যমে কেন দরখাস্ত পাঠালাম না? লেখক লিখেছেন, আমরা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম এবং পুনরায় তার মাধ্যমে দরখাস্ত দিলাম। কিন্তু দীর্ঘ দিন হয়ে গেছে আমাদের দরখাস্তের উপর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি। আমরা জানতেও পারি নি যে, আমাদের দরখাস্তের কী হয়েছে। আমাদের যে কষ্ট ছিল তা আমরা এখনও ভোগ করছি।

এখানে দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট সাহেবের পক্ষ থেকে বকাঝকা করা হয়েছে, ক্ষমা চাওয়ানো হয়েছে, পুনরায় দরখাস্ত লেখানো হয়েছে। কিন্তু পুনরায় সেই দরখাস্তের ওপর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। সেই প্রেসিডেন্ট সাহেব যদি মনে করে থাকেন যে, সেই ব্যক্তির আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে তাকে ভালবাসা ও আন্তরিকতা সহকারে বুঝিয়ে দেয়া উচিত ছিল। সাহায্যই যদি না করবেন তাহলে পুনরায় দরখাস্ত লিখানোর যৌক্তিকতা কী? এসব কাজের ফলে বিনা কারণে জামাতের মাঝে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এমন কাজ কখনই করা উচিত নয়। ওমারা (আমীরগণ) হন বা প্রেসিডেন্ট সাহেবগণ হন, আপনারা সর্বদা স্মরণ রাখবেন, আপনারা যুগ -খলীফার প্রতিনিধি হিসাবে জামাতে নিযুক্ত হয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সর্বদা বিবেচনা করবেন, তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা।

হযরত আবুল হাসান বর্ণনা করেছেন, আমর বিন মুর্‌রা হযরত আমীর মুয়াবিয়াকে বলেছিলেন, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, "যে আমীর অভাবী, গরীব, বিপদগ্রস্থদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখে আল্লাহ্‌তাআলাও তার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার জন্য আকাশের দরজা বন্ধ করে দেন। হযরত মুয়াবিয়া এ হাদীস শোনার পর এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করেছিলেন, যে তার পক্ষ থেকে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতেন এবং এর সমাধান করতেন।" আমাদের জামাতের নেযাম এজন্যই কায়েম করা হয়েছে। হযরত মা'য বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত (সঃ) বলেছেন, 'তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। কোন অন্যায় যদি করে বস তার বদলে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে চেষ্টা কর। তোমার পুণ্যকর্ম তোমার মন্দ কাজের প্রভাবকে মিটাবে। মানুষের সাথে সদাচরণ কর, ভাল ব্যবহার কর।'

হযরত আবূ বুর্‌দা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) হযরত আবু মূসা ও মা'যবিন জাবালকে ইয়ামেনের দুই বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। যাবার সময় তাদেরকে আদেশ দিলেন, "তোমরা মানুষের জন্য সহজ অবস্থা, সহজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে, মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হবে না। ভালবাসা ও আনন্দকে প্রসারতা দিবে। ঘৃণাকে বৃদ্ধি পেতে দিবে না।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সঃ) দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মাঝে কোন অংশের শাসন-ক্ষমতা লাভ করে এবং সে আমার মুসলমানদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করে তুমিও তার উপর কঠোরতা প্রদর্শন করিও। আর যে ব্যক্তি শাসন-ক্ষমতা পেয়ে মানুষের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করে তুমিও তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করিও।"

আমাদের ওহ্দাদারগণ আমীর, প্রেসিডেন্ট বা যে কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলের প্রধান কাজ হলো ঃ আপনারা নিজেদের এবং জামাতের সকল মানুষের মাঝে জামাতী নেযামের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি করবেন। জামাতের সদস্যগণেরও এটাই আসল কাজ আপনারা নিজেদের মাঝে, নিজ বংশধরদের মাঝে জামাতী নেযামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি করবেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছিলেন, 'আমি জামাতের ওহ্দাদারদের উদ্দেশ্যে যে-সব নসীহত করি এর অর্থ এই নয় যে, সেসব নসীহত কেবলমাত্র ওহ্দাদারদের জন্যই প্রযোজ্য। বরং ওসব নসীহতের উপর সকলের আমল করা জরুরী। অনেক সময় এমন হয় যে, একজন ওহ্দারের স্থান পরিবর্তনের কারণে বা মারা যাবার কারণে বা যে কোন কারণে অন্য একজনকে তার জায়গায় নিযুক্ত করা হয়। আবার নির্বাচনের সময় নির্বাচিতও হয়। সদস্যপদ পরিবর্তনও হয়। অতএব প্রত্যেকের চিন্তা থাকা উচিত যে, যখন কেউ ওহ্দাদার নির্বাচিত হন তখন সে একজন সেবক (খাদেম) হিসাবে দায়িত্ব নিবেন।

অনেক সময় ওহ্দাদার পরিবর্তনও করা হয়। যুগ-খলীফা নিজে কোন সময় কোন ব্যক্তিকে পরিবর্তন করেছেন। যা হোক নতুন নতুন লোক ওহ্দাদার হতে থাকবেন। নতুন যারা আসবেন তাদেরও চিন্তা-ভাবনা এবং তরবিয়ত আগে থেকে থাকা দরকার। তরবিয়ত বা ট্রেনিং থাকলে ওহ্দাদার হবার পর কাজ করা তার জন্য সহজ হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে এ দায়িত্ববোধ থাকতে হবে যে, সে জামাতী নেযামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং অন্যদের নেযামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করবে। তাহলে যুগ-খলীফা চিন্তামুক্ত থাকতে পারবেন যে, আমার জামাতে দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, যে কোন কাজের জন্য উপযুক্ত লোক সব সময় পাওয়া যাবে। মোট কথা, সকল ক্ষেত্রে নেযামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করতে হবে এবং একে সঠিক দিকে পরিচালনা করতে হবে। এজন্য ওহ্দাদারদের সামনে দু'ধরনের মানুষ আসবে। প্রথমতঃ জামাতের সাধারণ সদস্যবৃন্দ। যত বেশি সাধারণ মেম্বারগণ নেযামের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে কমবেশি দৃঢ় হবে, যতবেশি নেযামের সাথে এদের সম্পর্ক ভাল হবে, এরা যত বেশি আনুগত্য করবেন, যত বেশি এরা কুরবানী করবেন, তত বেশি জামাতী নেযাম শক্তিশালী হবে। কীভাবে তাদের মাঝে এ সমস্ত গুণ সৃষ্টি হবে? ওহ্দাদারদের এ বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? এ বিষয়ে আমি সংক্ষেপে বলেছি। ওহ্দাদারগণ (আমেলা-সদস্য) যত বেশি সকলের সাথে আন্তরিকতা ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখবেন তত বেশি সাফল্য লাভ হবে। উভয় পক্ষের মাঝে যত বেশি সুসম্পর্ক বজায় থাকবে তত বেশি জামাতের নেযাম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে, বিনা বাধা-বিপত্তিতে চলতে থাকবে এবং ততবেশি পৃথিবীর অন্য মানুষদেরকে উত্তম নমুনা দেখাতে পারব, এত বেশি জামাতের নেযাম সুন্দর মনে হবে যত বেশি জামাতের সকল সদস্যের সাথে ওহ্দাদারদের সুসম্পর্ক হবে। যুগ-খলীফাও চিন্তামুক্ত হতে পারবেন যে, জামাতী নেযাম সঠিক ও সুদৃঢ় মযবুত ভিত্তিতে কায়েম হয়েছে। আমার আশা পূরণ হবে। কোন স্থানে যদি জামাতের নেযাম খুব উত্তমভাবে পরিচালিত হতে দেখা যায়, নিশ্চিন্ত থাকব যে, যথেষ্ট পরিমাণে জামাতী কাজের জন্য কর্মচারী-কর্মকর্তা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কোন স্থানের জামাত খুব দুর্বল অবস্থায় থেকে গেলে এটি বড় চিন্তার কারণ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জেলায় এ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা ওহ্দাদারগণের কর্তব্য দেখতে হবে কোথায় কোন দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে? নিজ নিজ কার্যক্রমের উপর নিকট থেকে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রত্যেক মজলিসে আমেলার সকলের কর্মকান্ড সম্পর্কে খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে হবে। তারা সবাই সম্পূর্ণভাবে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

কোন ওহ্দাদার এমন আছেন কিনা যে, ওহ্দা (সদস্যপদ) এমনিতেই দেয়া হয়েছে, অস্বীকার করা ঠিক হবে না। অতএব কাজ হোক না হোক সদস্যপদ থাকল। কাজ হয় হোক বা না হোক এভাবে সেই জামাতের নেযাম ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। এটা বেশি মন্দ কথা, বেশি বড় পাপ, তার চেয়ে অনেক ভাল কাজ হবে সদস্যপদ ছেড়ে দেয়া ও ক্ষমা চেয়ে নেয়া। নতুবা এমন সদস্য জামাতের জন্যে ক্ষতিকারক।

ওহ্দাদারগণের দায়িত্ব-কর্তব্যের এটাও একটি যে, তারা নিজেরা পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন করবেন, নিজের মহান পদমর্যাদা হোক বা আপনার চেয়ে (ছোট পদমর্যাদার অধিকারী ওহ্দাদার হোক ছোট বড় ভেদাভেদ নেই) সবাই সবাইকে সম্মান প্রদর্শন করবেন। এসব ওহ্দা বা পদমর্যাদা এগুলো জাগতিক পদ নয়; কেউ যেন মনে না করেন যে, পদ লাভ করেছি। অতএব এখন আমি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছি। এখানে আল্লাহ্র আদেশ আছে যে, আমীর নিজ আমেলার সদস্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। তাদের মতামত বা পরামর্শকে গুরুত্ব দিবেন। তাদের পরামর্শকে গুরুত্বসহ বিচার-বিবেচনা করবেন। অনুরূপভাবে কোন অধীনস্থ কর্মচারী বা কর্মকর্তা যদি কোন পরামর্শ দেয় তাকে গুরুত্ব দিবেন; হেয় মনে করবেন না। আঁ হযরত (সঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তুমি পরামর্শ কর। এরপর আমাদের আর কি এমন মর্যাদা থাকতে পারে যে, আমরা পরামর্শ নেব না? কোন পরামর্শকে অহংকারের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করবেন না। প্রত্যেক সদস্যের একটি সম্মানজনক অবস্থান রয়েছে। কারো কথা শোনা মাত্রই রাগান্বিত হয়ে কোন সদস্যের রায় বা মতামতকে প্রত্যাখ্যান করবেন না এবং মসজিদে বা মজলিসে আমেলার মিটিং-এর মাঝেই (একে অপরের বিরুদ্ধে) তুই-তোকারি পর্যন্ত গড়াবেন না। কোন সদস্যের সাথে এমন ব্যবহার করবেন না যদ্বারা তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনেক বড় সাহসী ও প্রশস্ত ও বিশাল মনের অধিকারী হওয়া উচিত। স্পষ্ট ও খোলা মন নিয়ে সমালোচনা ও তথা নিজের মতের বিপরীত মতও শোনা উচিত, ধৈর্য ধারণ করা উচিত। প্রত্যেকের ব্যক্তি-মর্যাদার প্রতি

খেয়াল রাখা উচিত। যুক্তি সহকারে কথার উত্তর দেয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, "আমি যা বলে দিয়েছি-এর বিপরীত কেউ কোন কথা বলবে না। তোমরা আমার কথা কেন মানবে না- তোমরা এমন, তোমরা তেমন।"

জামাতের প্রত্যেক ওহ্‌দাদার (সদস্যপদের অধিকারী) একজন সম্মানিত ওহ্‌দাদার তার সদস্যপদ ছোট হোক আর বড় হোক। কে কত দীর্ঘ দিন ধরে আমেলার সদস্য আছেন অথবা কে অল্প দিন হোল সদস্য হয়েছেন- সবারই সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। কোন কম বয়সী ওহ্‌দাদার বা কোন ছোট পদের অধিকারী সদস্যের সাথে কথা-বার্তায় কোন বয়সে বড়, বা বড় পদের অধিকারী ওহ্‌দাদার হেয় বা অবমাননাকর কথা বলেন, যাকে হেয় ও তুচ্ছ করা হয়েছে সে হয়ত বড় হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার কারণে অথবা নেযামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতঃ আনুগত্যের কারণে সহ্য করে নিবেন। কিন্তু এমন সদস্যের এমন ঘটনা যাতে একজন সদস্য অপর একজনকে অবহেলা করেছেন আমার সামনে আনা হলে আমি অবশ্যই তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেব তা সে যত সিনিয়র বা বয়স্ক সদস্যই হন না কেন।

সুতরাং সবাই পরস্পরকে সম্মান করতে শিখুন। পরামর্শ নিতে এবং পরামর্শকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে শিখুন। ভাল পরামর্শ তো হতে পারে। এমন নয় যে, আপনি বয়স্ক অতএব আপনার চেয়ে ভাল পরামর্শ কেউ দিতে পারবে না।

এরপর আমাদের জামাতের নেযামে কাযার নেযাম রয়েছে (বিচার ব্যবস্থা)। কাযা-র (বিচার) বিষয় এমন যে, প্রত্যেক কাযীর (বিচারক) উচিত কোন পক্ষের কোন কথা মাথায় না রেখে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন নিয়ে দোয়া করার পর মামলার বিচার কাজ আরম্ভ করা উচিত। কোন পক্ষ যেন এ রকম মনে করতে না পারে যে, কাযী অপর পক্ষের কথা বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন অথবা আমার বিষয়গুলো পুরোপুরি বিচার-বিবেচনা করা হয় নি। এমনিতে যার বিপক্ষে রায় দেয়া হয় তার মনে অভিযোগ তো থাকবে- সেটা ভিন্ন কথা। কাযী বা বিচারকের নিজের অন্তর নিজের বিবেক পরিষ্কার রাখতে হবে যে, (আমি নিরপেক্ষ আছি)।

হাদীসে আছে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যখন কোন বিচারক চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক রায় বা সিদ্ধান্ত দেন, তার সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয় তাহলে সে দুটো পুণ্য লাভ করবেন। আর শত চেষ্টা করেও যদি সঠিক সিদ্ধান্ত না দিতে পারেন তবুও পরিশ্রমের কারণে একটি পুণ্য অবশ্যই পাবেন।

আঁ হযরত (সঃ) যখন হযরত মা'য (রাঃ)-কে ইয়ামেনের বিচারক করে পাঠালেন, যাবার পূর্বে হযরত মা'যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কীভাবে বিচার কার্য চালাবে?' হযরত মা'য বললেন, 'আমি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব।' আঁ হযরত (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কিতাবুল্লাহ্‌র আলোকে যদি কোন বিষয় খুঁজে না পাও তখন?' হযরত মা'য বললেন, 'তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-এর সুন্নতের আলোকে ফয়সালা করব।' আঁ হযরত (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'সুন্নতের মাঝেও কোন স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা যদি না পাও তখন কী করবে?' হযরত মা'য বললেন, 'কিতাবুল্লাহ্‌ ও সুন্নতের মাঝে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না পেলে নিজে খুব চিন্তা-ভাবনা করে ফয়সালা করতে চেষ্টা করব এবং এ ব্যাপারে কোন গাফিলতি করব না।' আঁ হযরত (সঃ) হযরত মা'যের জবাবে খুশী আর তার বুকে সাবাস দিয়ে হাত মেরে বললেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌, 'আল্লাহ্‌র শোকর, তুমি যে সঠিক জিনিস বুঝতে পেরেছ যা আল্লাহ্‌র রসূলেরও পসন্দমত (সঃ)।'

এটি হচ্ছে ফায়সালা গ্রহণের মৌলিক নীতি। কুরআন সুন্নত, তারপর খলীফাগণের কোন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় তাহলে সেমত ফয়সালা করব। আর যদি কোন জায়গা থেকে স্পষ্ট কিছু না পাওয়া যায় তাহলে খুব চিন্তা - ভাবনা করে দোয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বা রায় দিতে হয়। বর্তমানে প্রায় সব কিছুর উপর লিখিত বই-পত্র পাওয়া যায়। অধিকাংশ মাসলা-মাসায়েল লিখিত আকারে পাওয়া যায়। অতএব এসব শিক্ষার আলোকে ফয়সালা হওয়া উচিত।

হযরত উমর (রাঃ)-এর একখানা পত্র তিনি হযরত আবূ মূসা আশআরীকে লিখলেন। এর উদ্ধৃতি পড়ে শোনাচ্ছি। হযরত উমর (রাঃ) লিখেছেন "কাযা (বিচার-কার্য) একটি শক্তিশালী ধর্মীয় কর্তব্য এবং অবশ্য-পালনীয় সুন্নত। যখন কোন মামলা আপনার সামনে পেশ করা হয় তখন আপনি খুব বিবেচনা করে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করবেন। কারণ কেবল সত্য কথা বলা এবং এর প্রতিষ্ঠা না করা কোন কাজে আসে না।" সত্য কথা বলে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা না করাতে কোন লাভ নেই। সকল দিক থেকে মজলিস বা সভা বা সকল স্থান, সকল ব্যক্তির মাঝে ন্যায়-বিচারের সাথে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন। সকলের সাথে এক রকম ব্যবহার করবেন যেন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে কোন অবিচার করাবার আশাই করতে না পারে। কোন দুর্বল ব্যক্তি যুলুম ও অবিচারের ভয়ে ভীত না হয়।

সাক্ষী প্রমাণ দেয়া বাদী পক্ষের কর্তব্য। আসামী পক্ষ কসম-এর আশ্রয় নিতে পারে। মুসলমানদের মাঝে আপোষ-রফা (মিলমিশ) করার চেষ্টা করা ভাল কথা। কিন্তু এমন হওয়া উচিত হবে না যদ্বারা হারাম হালাল বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ জামাতের বিপরীত কোন কিছুই জায়েয হবে না। যদি আপনি কালকে একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন এবং আজ বুঝতে পারেন যে, গত কালের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল তাহলে গতকালের ভুল সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করে আজ সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে মোটেই দ্বিধা করবেন না বা লজ্জাবোধ করবেন না। কারণ সত্য ও ন্যায়ই আসল। অতএব সত্যকে গ্রহণ করা অন্যায়ের মাঝে আবদ্ধ থাকার চেয়ে অনেক বেশি শ্রেয়। যে বিষয় আপনার অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং সে সম্পর্কে কিতাব ও সুন্নতে সুস্পষ্ট দিক -নির্দেশনা পান সে বিষয়ে খুব বিবেচনা করবেন তার অনুরূপ উদাহরণ খুঁজে দেখবেন এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন। তারপর সকল দিক দেখে (কিয়াস) অনুমান করে ফয়সালা করবেন। যে ফয়সালা আল্লাহ্‌র চোখে পসন্দনীয় হবে বলে মনে হয়, সত্য ও ন্যায়-এর বেশি কাছাকাছি বলে মনে হয় সেই ফয়সাল গ্রহণ করবেন। বাদী পক্ষকে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার জন্য যথেষ্ট সময় দিবেন। নির্ধারিত তারিখে বাদী পক্ষ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে পারে তাহলে তো সেই অনুসারে কাজ করবেন আর সাক্ষ্য-প্রমাণ যদি দিতে না পারে তাহলে তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করবেন। এ পদ্ধতি অজ্ঞতাকে দূর করার পদ্ধতি, এবং মূর্খতাকে

দূর করার পদ্ধতি। অর্থাৎ এভাবে বিতর্কিত বিষয়ে সমাধান করা যাবে। আপনার বিরুদ্ধে প্রত্যেক অভিযোগের যথেষ্ট উত্তর হবে।

সাক্ষ্য দেবার যোগ্যতা সকল মুসলমানের সমান। যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্যতা রাখে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে ফয়সালা করা হবে। তবে কোন ব্যক্তি যদি পূর্বেই নির্ধারিত পরিমাণ-এর শাস্তি পেয়ে থাকে তাহলে এমন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অথবা কোন ব্যক্তি ইতোপূর্বে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়ে থাকলে অথবা ইতিপূর্বে তার চরিত্রের উপর কলংক আরোপিত হয়ে থাকলে অথবা নিজের বংশ পরিচয়ের যে দাবী কেউ রাখে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য সত্য হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। বাকী যে কোন মুসলমানকে আদালতে সাক্ষী দেবার যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। কারণ কার অন্তরে কী আছে তা কেবল আল্লাহ্ জানেন। কেউ যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তার শাস্তি আল্লাহ্ তাকে দিবেন। আল্লাহ্ তোমাদের স্পষ্ট প্রকাশ্য সাক্ষ গ্রহণের মাধ্যমে বিচার কার্য চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এ কথাও স্মরণ রাখ যে, খুব তাৎক্ষণিক অধীর ও অস্থির হওয়া থেকে বিরত থাক, মানুষের পক্ষ থেকে খুব দ্রুত কষ্ট অনুভব করো না। মামলার উভয় পক্ষের প্রতি ঘৃণার মনোভাব রেখ না। সত্য ও ন্যায়বিচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে এসব কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক। যারা সত্য বিচারের চেষ্টায় সহযোগিতা করে আল্লাহ্ তাদেরকে পুরস্কার দিবেন। এমন ব্যক্তির সুনাম সৃষ্টি করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিজের নিয়্যতকে পবিত্র রাখে আল্লাহ্তাআলা তাকে মানুষের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি লোভ দেখানো কৃত্রিমভাবে নিজেকে ভাল মানুষ বলে প্রকাশ করে কোন না কোন দিন আল্লাহ্ তার গোপন রহস্য প্রকাশ করে দিবেন। তার অপমানিত হবার উপকরণ সৃষ্টি করে দিবেন।

এ ছাড়াও ওহ্দাদারদের সম্পর্কে কিছু সাধারণভাবে জ্ঞাতব্য বিষয়ও রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি। আল্লাহ্র ফযলে আমাদের জামাতে কেউ সদস্যপদ (ওহ্দা) লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। যখন সদস্যপদ লাভ করেন তখন তারা ভয়ে ভীত হন যে, আমি অযোগ্য, কীভাবে দায়িত্ব পালন করবো? কিন্তু কারো কারো মাথায় গন্ডগোলও থাকে। লিখে দেয় যে, "আমাদের জেলায় জামাতের কোন কাজ হচ্ছে না। আমি যদিও জানি সদস্যপদ (ওহ্দা) চাওয়া উচিত নয়, তবুও আমি মনে করি, আমাকে যদি জেলার আমীর নিযুক্ত করা হয় (অথবা অমুক ওহ্দা দেয়া হয়) তাহলে আমি ছয় মাসে বা এক বছরের মাঝে সকলের সংশোধন করে দিব।" এমন মাথা খারাপও কেউ কেউ হয় যে, স্পষ্ট লিখে দেয়। আর অন্যরা বড় চালাকীর মধ্য দিয়ে এ কথাই ব্যক্ত করে থাকে। আমি সকলকে খুব স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, আমাদের জামাতের নেযামের পদ্ধতি এই যে, কারো নাম যদি নির্বাচনের সময় উপস্থাপিত হয়েও যায় তবুও সে নিজের নামের পক্ষে ভোট দেবার অধিকার রাখে না। নিজেকে ভোট প্রদান করাও প্রমাণ করে, 'সে নিজেকে যোগ্য মনে করছে।' যারা নিজেদেরকে যোগ্য মনে করেন তারা আঁ হযরত (সঃ)-এর এ হাদীস স্মরণ রাখবেন। হযরত আবূ মূসা বর্ণনা করেছেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিলাম, আমার সাথে আমার দু'জন চাচাত ভাইও ছিল। তাদের মাঝে একজন বলল, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্তাআলা যে সমস্ত দেশের শাসন-ক্ষমতা দিয়েছেন, আমাদেরকে কোন দেশের আমীর নিয়োগ করে দিন।" অন্যজনও এ রকম বলল। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "আল্লাহ্ কসম! কোন অঞ্চলের শাসন-ক্ষমতা আমরা এমন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করি না, যে এর জন্য আবেদন করে বা এর লোভ করে।"

আব্দুর রহমান বিন ছামরা (লাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ "হে আব্দুর রহমান! কোন ওহ্দা (সদস্য পদ) বা শাসন-ক্ষমতা লাভের আবেদন করবে না। কারণ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ক্ষমতা লাভ হলে এর ভারী বোঝা তারই কাঁধে পড়বে, আর আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই তার উপর কোন দায়িত্বভার চাপিয়ে দেয়া হলে তার সাথে আল্লাহ্র সাহায্য থাকবে।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন, কোন কোন ব্যক্তি ওহ্দা (সদস্যপদ) লাভের আশায় মজলিসে শামিল হয়। এমন লোক নিজের জাতির জন্য অভিশাপ হয়, নিজের নফসের জন্য অভিশাপ হয়। এরা এমন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা কুরআন শরীফের বলেছেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝

[অনুবাদ ঃ দুর্ভোগ সে নামাযীদের জন্য, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন, যারা কেবল লোক দেখায়, (সূরা আল্ মাউন ঃ ৫-৭)।

এদের মাঝে কেবলমাত্র বেয়াকারী লোক দেখানোর বড় আগ্রহ থাকে কাজ করার কোন আগ্রহ থাকে না।

জামাতের কর্মীবৃন্দকে হেদায়াত দেবার সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) একবার বলেছিলেন ঃ

"কর্মীবৃন্দের উচিত প্রাণ-পণ চেষ্টা করে কাজ করে যাওয়া, আমাদের সুনাম হোক। এমন ইচ্ছা মানুষকে নষ্ট করে দেয়। এ ধরনের ইচ্ছা পোষণের কারণে অনেক মানুষ নষ্ট হয়েছে এবং হতে থাকবে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ভয় করতে থাক। এ কথা স্মরণ রাখ যে, তাঁর জন্য কাজ করবে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা করবে। মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা কর না।' আল্লাহ্ আমাদের কাজে ঐশী ইচ্ছা সৃষ্টি করুন; আল্লাহ্তাআলা তোমাদের প্রতি দয়া করুন। আমার প্রতিও দয়া করুন, (আমীন)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ

"আমি জামাতের নেযামের কর্মকর্তাদের নসীহত করছি, আপনারা বিশেষ করে নিজেদের চরিত্রের সংশোধন করুন। কোন জেদী লোকও যদি এসে যায় আপনার কাছে আপনি তাকেও মহব্বতের সাথে বুঝাতে চেষ্টা করুন। পুরোপুরি পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম করার অভ্যাস করুন। এ বিষয়ে আল্লাহ্তাআলা সূরা আন্ নাযে 'আত বলেছেন ঃ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝

(সূরা আন্ নাযে'আত) কসম তাদের যারা (লোকদেরকে সত্যের দিকে) পূর্ণ মনযোগের সাথে আকর্ষণ করে। এবং কসম তাদের যারা গ্রন্থিসমূহকে দৃঢ়ভাবে বাঁধে।"

এখানে ইঙ্গিত করেছেন, মু'মিন যখনই কোন কাজে ব্যস্ত হয় তখন খুব মনোযোগ দিয়ে কাজের মাঝে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলে। সে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করে।

এমতাবস্থায় যদি বিরোধীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাহলে দোয়ার মাধ্যমে তার বিহিত-ব্যবস্থা করা উচিত। অবস্থা দেখে কখনও অস্থির হওয়া উচিত নয়। অবিচল থাকা উচিত।

অন্য এক ক্ষেত্রে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ নিজ নিজ জামাতে আমীর সাহেবেরা, প্রেসিডেন্টরা দরস দিবেন। এতে কেবল ওয়ায নসীহতই হবে না কারণ এখানে বাস্তবতা রয়েছে। কুরআন করীম কেবল ওয়াযই নয় বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলেছে (উদাহরণ দিয়েছে)। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বই পুস্তকেও বাস্তব অভিজ্ঞতার উদাহরণ দেয়া হয়েছে। একজন সাধারণ নসীহতকারী বলেন, 'কুরআন শরীফে একথা আছে। কিন্তু একজন নবী কেবল একথা বলেন না যে, অমুক কিতাবে একথা লেখা আছে, বরং বলেন, 'আমার অন্তরেও একথা লেখা আছে। আমাদের মুখে এ কথা লেখা আছে।' তাদের বক্তব্যে নসীহত তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা থাকে। তাই তাঁদের কথায় বড় শক্তি থাকে। ..."। অতএব জামাতের দরসের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এতে করে নিজেদের এবং জামাতের তরবিয়তের ভাল ব্যবস্থা হতে পারে।

অবশেষে সারাংশ আকারে পুনরায় বলে দিচ্ছি- আমি ওহ্দাদারদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বললাম, পূর্বেও খলীফাগণ বলে এসেছেন। কিছুকাল পর পর আবার বলতে হয় কারণ অনেকে ভুলে যায়, অনেক নতুন ওহ্দাদার (আমেলার সদস্য) হয়ে আসেন। তাই বার বার স্মরণ করতে হয়। সারাংশ এই যে, (১) সদস্যগণ নিজেরা আনুগত্যের উত্তম নমুনা দেখাবেন, নিজের উপরস্থ কর্মকর্তার পুরোপুরি আনুগত্য করবেন। আপনি যদি আপনার উপরস্থ কর্মকর্তার আনুগত্য করেন, দেখবেন, আপনার অধীনে যারা তারাও আপনার আনুগত্য ও ইয্যত করবেন। (২) স্মরণ রাখবেন, সকলের সাথে নম্রতা দেখাবেন। সকলের মন জয় করতে হবে, তাদের সুখ-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে, তাদের কাজ করে দিতে হবে। আপনি যদি এমন না করেন এর অর্থ এই যে, এমন ওহ্দাদারের মনে অহংকার আছে। (৩) আমীর সাহেবেরা, প্রেসিডেন্ট সাহেবান, এবং কেন্দ্রীয় কর্মচারী, কর্ম-কর্তারা দোয়া করবেন যেন, আপনাদের সাথে বা অধীন কর্মচারী, কর্মকর্তারাও যেন ভদ্র ও সুশীল স্বভাবের হন, নেযামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য যেন তাদের মাঝে থাকে। (৪) কখনও কোন বিষয়ে জামাতের কোন ব্যক্তির সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না। (৫) একথাও স্মরণ রাখবেন যে, কিছু লোক বড়ই বক্র স্বভাবের হয়ে থাকে। আমি জানি, এরা আমীর বা ওহ্দাদারদের ঘাম ছুটিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। কিন্তু তারপরও যতদূর সম্ভব তাদের বেআদবী সহ্য করবেন। তাদের পক্ষ থেকে যত কষ্টই পেতে থাকেন- কোন প্রকার অভিযোগ করবেন না, প্রতিশোধের কথা কখনও মনে আনবেন না। তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করুন।

নেযামে জামাতের দৃঢ়তা ও হেফাযত সবার উপরে থাকা চাই। এর জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

কখনই নিজের আশপাশে যারা 'জ্বী-হুযূর' (ইয়েস স্যার) করে তাদেরকে একত্র হতে দিবেন না। যখনই কোন ওহ্দাদারের উপর এদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এরপর তার কাছ থেকে কোন ন্যায়বিচার আশা করা যায় না। এমন ওহ্দাদার এদের হাতের খেলার পুতুল বনে যায়। এজন্যই আঁ হযরত (সঃ) দোয়া করেছেন যে, 'কখনই মন্দ পরামর্শ দাতারা যেন একত্র না হয়।'

আগেই বলেছি, যতক্ষণ নেযামের সম্মান ও মর্যাদা বিপন্ন না হয় ততক্ষণ ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করবেন। তাদের জন্য ইস্তিগফার করতে থাকবেন যেন তাদের সংশোধন হয়।

উপরে তো ওহ্দাদারদের কথা বললাম। অবশেষে জামাতের সকল সদস্যের জন্য বলছি। যারা মজলিসে আমেলার সদস্য নন আপনাদের উপরও বড় দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের কাজ কেবল আনুগত্য, আনুগত্য এবং আনুগত্য এবং এর সাথে দোয়া করা। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফীক দান করুন।

অবশেষে একটি দোয়ার আবেদন করব। বাংলাদেশের অবস্থা বড় খারাপ। বেশ কিছু কাল থেকে সেখানকার অবস্থা উদ্বেগজনক। আজকেও বিরোধীরা বড় হুমকি দিয়ে রেখেছে যে, তারা আজ আমাদের মসজিদের উপর আক্রমণ করবে। আল্লাহ্তাআলা সকল অনিষ্ট থেকে অমঙ্গল থেকে আমাদের হেফাযত করুন। দরসের সময় আমি একটি দোয়ার আবেদন করেছিলাম। আবার বলছি, এ দোয়া সবাই খাসভাবে করবেন। অন্য দোয়াও করবেন। প্রত্যেক নবনিযুক্ত খলীফার যুগে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে যায়। হযরত সৈয়্যদা নবাব মোবারকা বেগম (রাঃ) স্বপ্ন যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দেখেছেন। হযরত মসীহ্ (আঃ) স্বপ্ন যোগে তাঁকে বলেছেন, জামাত যেন এ দোয়া পড়ে ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদায়তানা ওয়াহাবলানা মিল্লা দুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওহ্হাব।"

অনুবাদ ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পরে আমাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিও না। এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের প্রতি রহমত কর। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯)

এ দোয়া বেশি বেশি করবেন। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

(সরাসরিএমটিএ-হতে ধারণকৃত)

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

একটি আন্তরিক সদুপদেশ

(এক হরফে নাসেহানা)

বিগত কিছুকাল যাবৎ পাকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকায় কোন কোন বিশেষ মহলের পক্ষ থেকে এ আওয়াজ উত্থাপন করা হচ্ছে যে, আহমদীদিগকে (পাকিস্তানে) যেহেতু একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে 'অমুসলিম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেজন্য তাদেরকে ইসলামী শায়া'য়ের পরিভাষা- যেমন নবী, রসূল, সাহাবী, উম্মুল মু'মিনীন, আহ্‌লে বায়ত, আলায়হিস সালাম, রাযিয়াল্লাহুআনহু, মসজিদ, আযান ইত্যাদি ব্যবহারে বাধারোপ করা হোক, কেননা এতে মুসলমানদের ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগে।

যাই হোক, ভাসাভাসা দৃষ্টিপাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত দাবী ইসলামের সার্বজনীন শাশ্বত, মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী নীতি ও শিক্ষামালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ ইসলাম ইনসানিয়তের মর্যাদা এবং বিবেকের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী। তারপর বিশ্বে সাধারণভাবে প্রচলিত সংসদীয় ব্যবস্থাসমূহ এবং আইনগঠনের সর্বস্বীকৃত দিক-নির্দেশক নীতিমালার প্রতিই দৃষ্টিপাত করুন। সেগুলোর নিরিখেও উল্লিখিত দাবী অগ্রহণযোগ্য এবং সেগুলোর মানদন্ডেও বাতিল ও উপেক্ষণীয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

১৯৭৩ সালের সংবিধানে ও সম্পাদিত ২নং সংশোধনী যাকে কেন্দ্র করে উক্ত দাবী উত্থাপন করা হয়েছে- উহা একটি 'সংজ্ঞা' (Definition) মাত্র। এ সংজ্ঞা অনুসারে আহমদীদেরকে সংবিধানওআইনের উদ্দেশ্যে মুসলমান বলে বিবেচনা করা হয় নি। অন্য কথায়, তা এরূপ একটি কানুন যা শুধু মাত্র মুসলমানদের জন্য প্রবর্তিত, এর প্রয়োগ আহমদীদের উপর হবে না। এটা ছাড়া এ আইনগত বা সাংবিধানিক সংশোধনীটি আর অধিকতর কোন কিছুর দাবী রাখে না, এবং সংবিধানের এ সংশোধনী আহ্‌মদীদের অপরাপর নাগরিক অধিকার এবং ধর্মীয় নিরাপত্তামূলক অধিকারকে কোন রূপেই নস্যাৎ, খর্ব বা সীমিত করতে পারে না।

ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম। কুরআন করীম খোদাতাআলার কালাম এবং এতে দেয়া শিক্ষামালা কোন বৈষম্য ছাড়া সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল ও কল্যাণ এবং রূহানী উন্নতির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত। ইসলাম বিবেক, চিন্তা ও চৈতন্যের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় পরমতসহিষ্ণুতার এত জোরদার প্রবক্তা যে, এর নজির অন্যান্য ধর্মে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং আলোচ্য দাবী ইসলামের নামে পেশ করাটা সুনিশ্চিৎ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যখন আমরা আলোচ্য দাবীটিতে অপেক্ষাকৃত কিছুটা বিস্তারিতভাবে দৃষ্টিপাত করি, তখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হয়, যেগুলো উপেক্ষা করলে আমরা কোন যুক্তি-যুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি না। যেমন কয়েকটি প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে,

(ক) পাকিস্তানের বর্তমান গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ সমষ্টির দৃষ্টিতে যদি আহমদীগণ অমুসলিম হয়ে থাকে তা হলে আহমদীরা কোন্ ধর্মের অনুসারী এবং তাদের সেই ধর্মটা কী?

(খ) আহমদীদের ধর্মও কি এ গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাব্যস্ত ও নিরূপণ করবে অথবা আহমদীরা নিজেরা তাদের ধর্ম নিরূপণ ও নির্দিষ্ট করার অধিকার রাখে?

(গ) আহমদীদের ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিরূপণ বা সাব্যস্ত করার কথা যদি হয়ে থাকে তা হলে আহমদীরা কি অধিকার রাখে না সেই সাব্যস্তকৃত ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করার এবং সেই আকীদার উপর ঈমান রাখার, যে আকীদা ও ধর্ম-বিশ্বাসে তারা সর্বান্তঃকরণে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে?

এটা স্পষ্ট যে, কোন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এ প্রশ্নগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনা করে এ ছাড়া আর অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না যে, আহমদীদের আকীদা ও ধর্মের কোন নামকরণের অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের যদিও বা থেকে থাকে, তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠদের এ অধিকার নেই যে, প্রথমে তারা আহমদীদের ধর্ম-বিশ্বাসের নাম তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কিছু রাখে, এরপর আবার তাদের ধর্ম ও নিজেরা রচনা করে দেয় এবং কোন কিতাবকে মানার এবং কোন কিতাবকে না মানার আদেশও দেয়। সুতরাং যখন একমাত্র আহ্‌মদীগণই নিজেদের ধর্মের বিবরণ ও রূপ-রেখা বিবৃত করার সঙ্গত অধিকারী, তা হলে ফয়সালা বা নিষ্পত্তি সাপেক্ষ বিষয় থেকে যায় শুধু এটুকুই যে, স্বয়ং আহমদীদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের আকায়েদ বা ধর্মীয়-বিশ্বাস কী এবং কোন্ কথা ও বিষয়গুলোর উপর আমল করা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং কী কী কথা বা বিষয় হতে বিরত থাকার আদেশ আছে বলে তারা বিশ্বাস করে। এটা সুস্পষ্ট যে, আহমদীদের ধর্ম-বিশ্বাস আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তবে শুনুন আহমদীয়া সেলসেলার প্রবর্তকের ভাষায় আহমদীদের ধর্ম-বিশ্বাস কী ঃ

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর 'আইয়ামুল সুলেহ্' পুস্তকে বলেছেন ঃ

'যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশ্‌র, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে-ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়া হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্**-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয়

কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদিসম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদিসম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য-কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?" (আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)।

"আমরা মুসলমান, 'ওয়াহেদ লা-শরীক' - এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান রাখি এবং **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু**- কলেমায় বিশ্বাসী এবং খোদাতাআলার কিতাব কুরআন করীম এবং তাঁহার রসূল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে, যিনি 'খাতামান-নবীঈন' মানি। ফিরিশ্‌তা, ইয়ামুলবা'স, দোযখ ও বেহেশ্‌তের উপর ঈমান রাখি। নামায পড়ি, রোযা রাখি এবং আমরা আহলে কিবলা। এবং খোদা ও রসূল (সঃ) যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম বলিয়া জানি এবং যাহা কিছু হালাল করিয়াছেন তাহাই হালাল বলিয়া নির্ধারিত করি। আমরা শরীয়তের কোন কিছু বাড়াইও না এবং কোন কিছু কমও করি না। এক কণা পরিমাণও কম বেশি করি না। বরং যাহা কিছু রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে-যদিও উহা বুঝিতে পারি অথবা উহার অন্তর্নিহিত রহস্য বুঝিয়া উঠিতে না পারি এবং উহার প্রকৃতস্বরূপ ও তত্ত্ব উদঘাটনে অক্ষম হই-তথাপি উহা স্বীকার করি ও পালন করি। আমরা খোদাতাআলার ফযলে খাঁটি তৌহীদে বিশ্বাসী মু'মিন মুসলমান" (নূরুল হক্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫)।

এ-ই হ'ল আহ্‌মদীয়া সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতার নিজ ভাষায় বর্ণিত আহমদীদের ধর্ম-বিশ্বাস। এ আহমদী ধর্ম-বিশ্বাসের নাম গয়র আহমদী সংখ্যাগরিষ্ঠগণ যা ইচ্ছা রাখুক কিন্তু আহমদীয়া ধর্ম-বিশ্বাসকে পরিবর্তন করার কোন অধিকার তাদের নেই।

দ্বিতীয় মৌলিক প্রশ্নটি হ'ল, আহমদীগণ যে ধর্ম-বিশ্বাসকে খাঁটি ইসলাম জ্ঞান করে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ ও আমল করে চলে আসছে তা যদি অপরাপরের দৃষ্টিতে ইসলাম না হয়ে থাকে বরং অন্য কোন ধর্ম হয়ে থাকে তা হলে তারা যা ইচ্ছা তা-ই এর নাম রাখতে পারেন, কিন্তু এ ধর্মের অনুসারীদিগকে তা মেনে চলায় বাধা দেয়ার কোন অধিকার জগতে কারো নেই।

এ-ই সেই বিষয়, যা সম্মুখে রেখে পাকিস্তানের সংবিধানে ২০নং আর্টিকেলটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত আর্টিকেল অনুযায়ী প্রতিটি পাকিস্তানী নাগরিকের এ অধিকার আছে, সে যে আকীদা এবং ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ করে থাকে তা সে প্রকাশ্যে অভিব্যক্ত করতে পারে, পালন করতে পারে এবং প্রচার করতে পারে।

যুক্তিগত ও ধর্মীয় শাস্ত্রগত আবেদনসমূহ উপেক্ষা করা হলেও বিবেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় এ সুস্পষ্ট সাংবিধানিক জামানতের পরে আলেমদের উল্লিখিত দাবী সাংবিধানিক পর্যায়েও আদৌ বিবেচনার যোগ্য নয়। (চলবে)

অনুবাদক - **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ মুরব্বী সিলসিলাহ্**

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

পর্ব ৩ ঃ অধ্যায় ঃ ২

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মাঝে খোদা-সম্পর্কীয় ধারণা

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

একথা ঠিক যে, এসব আদিবাসীদের বহু ধরনের কুসংস্কার আছে এবং ধর্মীয় রীতি অনুসারে সেগুলো পালনের ব্যাপারেও তাদের মাঝে বিভিন্নতা আছে, কিন্তু স্বপ্নের ব্যাপারটি একেবারে অন্য রকম (Radically different)। এক খোদাতে বিশ্বাসের মত স্বপ্নের সহজাত ব্যাখ্যা এ অর্থের ব্যাপারে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এটা তাদের মাঝে একটি স্থায়ী বিবেচনা বা বাস্তবতার রূপ পাওয়ায় এ সিদ্ধান্তই নেয়া চলে যে, এর একটা শক্ত ভিত্তি রয়েছে, বরং এটা বলাই যুক্তিযুক্ত

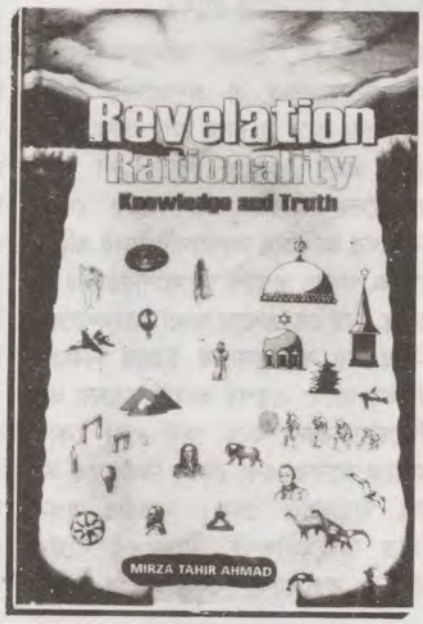

যে, স্বপ্নকে তারা ঐশী-নির্দেশনার একটা মাধ্যম হিসাবে মেনে চলে। এর গুরুত্ব ও সম্ভাব্য ব্যাখ্যার বিষয়ে তারা খুবই যত্নবান, এবং বলাই বাহুল্য যে, এটা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে একটা চর্চার বিষয়। কাজেই এটা অসম্ভব নয় যে, স্বপ্ন নিয়ে তাদের এই যে, গভীর চিন্তা ও ধ্যান (contemplation), এটাই প্রার্থনা করার এক ধরনের পদ্ধতি (just another name for prayer)। শুধু তাই নয়, একে মানা বা অমান্য করার বিষয়ে আদিবাসীরা একটা কঠোর বিধি বা শৃংখলাবোধের মাঝে নিবেদিত, যার ব্যতিক্রম হলে রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা (In relation to their dreams, the aborigines also have a strong and well defined discipline, the breach of which is punishable)।

কাজেই Howitt সাহেবের তালগোল পাকানো অভিমত যে,আদিবাসীদের কোন ধর্ম বা প্রার্থনার রীতি নেই এটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান - যোগ্য। আদিবাসীদের এ ধরনের কোন খেতাব দেয়া, অর্থাৎ তারা একটি ধর্মহীন সম্প্রদায় (Religionless people), কেবল সত্যকে অস্বীকার করার নামান্তর (Far from being justified)।

এবারে 'যাদুর' প্রভাবে তাদের মৃত্যু সংক্রান্ত বিশ্বাসের ব্যাপারে দু'একটি কথা বলা যায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর অন্যত্র সাধারণ অর্থে যাদুকে যেভাবে দেখা হয়, আদিবাসীদের যাদুর প্রভাবজনিত মৃত্যু কিন্তু সে বিশ্বাস পোষণ করে না। এর শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে ধারাণাগত যে বিষয়টি তাদের মাঝে মূখ্য সেটি তুলে ধরতে পারলেই বরং এর মর্মার্থ সকলের নিকট বোধগম্য হয়ে উঠতে পারে। এ 'যাদু' হচ্ছে মূলত সেই 'তাগূতী' বা শয়তানী প্রভাব, যা আধ্যাত্মিক অর্থে আলোর বিপরীতে অন্ধকার বা পাপের উপযোগী সৃষ্টি করে, যার পরিণতিতে মানুষের আধ্যাত্মিকভাবে মৃত্যু ঘটে। আদিবাসীদের যাদুর এ ধারণাগত দিকটি এতটাই সার্বজনীন ও সুবিন্যস্ত যে নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকদের চিন্তায় এ সহজ বিষয়টি যে কেন প্রতিভাত হয় নি তা ভেবে আমরা অবাক হই। এ 'যাদু' জনিত মৃত্যুর হাত থেকে 'উচ্চ ঈশ্বর' (High Gods) ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারে না। এটাই আদিবাসীরা মনে - প্রাণে বিশ্বাস করে। প্রশ্ন আসে যে, সেখানে কি মানুষ বিনা ব্যতিক্রমে এ যাদুর কুপ্রভাবেই মারা যায় অথচ, আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবো যে, সারা পৃথিবী ব্যাপীই মানুষের জন্ম-মৃত্যু একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এমন নয় যে, অষ্ট্রেলিয়াতে মানুষের মৃত্যু শুধু যাদুর প্রভাবে ঘটে থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা, তারা যতটাই সাদাসিদা বা সরল বলে কথিত হোক না কেন, তারা সকলেই যাদুর প্রভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে বলে বিশ্বাস করে- এমন বিবেকশূন্য বলে তাদের ভাবা যায় না। আসলে আধুনিক বিশ্ব 'যাদু' বলতে যা বোঝায়, সেই অর্থে আদিবাসী অষ্ট্রেলিয়রা কখনো 'যাদু'-কে বোঝাতে চায় নি। বরং পাপ বা আত্মম্ভরিতা, যা আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ, সেই অর্থেই তারা যাদুকে বোঝাতে চেয়েছে। আর এ বিবেচনায় অন্যান্য ঐশী ধর্মের শিক্ষার অনুরূপ এটি একটি চিরন্তন ও শাশ্বত উপলব্ধি। এ মূল্যবোধ থেকে যখন আমরা এসব আদিবাসীদের এ ধারণাকে বিশ্লেষণ করি, তখন একথা মেনে নিতে বাধ্য হই যে, সেই একই উৎস, যা যুগে যুগে, আহলে কিতাবদের (People of the Book) এক শাশ্বত খোদার অস্তিত্বের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই একই উৎস থেকেই এরাও আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে (They must have received the idea from the same source)।

বিকল্পভাবে আদিবাসীদের 'যাদু' সংক্রান্ত আরো একটি সহজ অর্থ নিয়েও আমরা ভেবে দেখতে পারি। বিভিন্ন ঘটনা যা আমরা প্রতিনিয়তই দেখি, কিন্তু যার কার্য-কারণ অনেক সময় আমাদের বোধগম্য হয় না (Inexplicable), সেটাও তাদের নিকট এক যাদু বা রহস্য হিসাবে (mystry) ধরা দিয়েছে। এ অর্থেই মৃত্যুর বিষয়টি যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি, এবং অসীম ও সীমাবদ্ধতার মাঝে পার্থক্য টেনে দেয়, এবং লোক থেকে এক রহস্যময় লোকান্তরে আমাদেরকে নিয়ে যায়-তা আদিবাসীদের অনুভূতিতে এক প্রকার যাদু। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, যার মর্মার্থ তারা বুঝতে অক্ষম, যার ব্যাখ্যা বা কারণ নির্ণয়ে তারা যোগ্যতা রাখে না, যা অনির্বচনীয় তা-ও সেই কারণে তাদের নিকট এক ধরনের যাদু।

একটা মিলের প্রসংগ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই। ইতিপূর্বে যরথুস্ত্রীয় মতবাদের ব্যাখ্যায় বিষয়টি কিছুটা আলোচিত হয়েছে। আলো-অন্ধকারের চিরন্তন দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে আলোর ঈশ্বর ও অন্ধকারের ঈশ্বরের মাঝে যে সংঘাতের কথা বলা হয়েছিল সেখানে, অনেকটা সে রকমই অষ্ট্রেলিয় আদিবাসীরা তাদের যাদুগ্রস্ত মৃত্যু দ্বারা অন্ধকার বা পাপজনিত কর্মের পরিণতিকে বুঝিয়ে থাকতে পারে (May have the same significance as darkness representing sin or satan) এবং সেভাবেই তারা হয়তো এটার কথা বলেছে।

কিন্তু স্বপ্নে বিষয়টি আদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি কেন্দ্রীয় দিক এবং স্রষ্টার সাথে এর মাধ্যমেই তাদের ভাব-বিনিময় হয়, অর্থাৎ, স্বপ্ন হচ্ছে স্রষ্টার নিকট হতে তাদের নিকট কোন ঐশীবাণী প্রেরণের মাধ্যম (means of receiving communication from Him)। তাই প্রচলিত ধর্ম-ব্যবস্থা হিসাবে আদিবাসীদেরকে পাশ্চাত্য গবেষকরা স্বীকৃতি দিক আর না দিক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যেই যুক্তিতে সেসব গবেষক এ অভিমত পোষণ করেন, তা তাদের পূর্ব-ধারণা বা তত্ত্বের বশবর্তী হয়ে বাস্তব ঘটনা সেই ধারণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। লেখকের সাথে এক শিক্ষিত আদিবাসীর পরিচয়ের প্রসঙ্গ এ পর্বের শুরুতে উদ্ধৃত করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন পেশাগত দিক থেকে একজন প্রকৌশলী। যদিও তিনি খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু আদিবাসীদের সমৃদ্ধ জীবনবোধ সম্পর্কে তার শ্রদ্ধাবোধ তখনো অটুট রয়েছে বলে তিনি লেখকের নিকট অকপটে স্বীকার করেন। এসব সমাজবিজ্ঞানী আদিবাসীদের সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা খুবই ভাসাভাসা (mostly peripheral), এর মাঝে খুব একটা গভীরতা নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশেষ করে আদিবাসীদের স্বপ্নের উপলব্ধিকে পাশ্চাত্য গবেষকরা যেভাবে চিত্রিত করেছে এবং বিষয়টিকে নিয়ে যেরূপ হালকা কথা-বার্তা বলেছে তাতে তিনি ভীষণভাবে বিরক্ত বলে লেখককে জানান (He showed particular disgust at the manner the aborigines experience of dreams was treated and portrayed by the western researches)।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের চল্লিশভাগের (Divine dreams are one frotieth part of prophethood)। মূলত, এ ধরনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই নবুওয়তের শুরু হয় (it is the dreams with which prophethood begins)। আর পরবর্তীতে এ অভিজ্ঞতাই খোদার কোন মনোনীত বান্দার জন্য ঐশীবাণী প্রাপ্তির পথকে সুগম করে। আর যুগ ও সময়ের প্রয়োজনে আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন, তখন এরূপ কোন মহান ব্যক্তিকে ঐশীবাণী সহকারে তাঁর প্রেরিত পুরুষ হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেন। (When He so pleases, commissions the receipent to be His Messenger)। (চলবে)

সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ - অধ্যাপক মোহাম্মদ আমীর হোসেন

আমাদের সালানা জলসা ঃ
আহমদীয়তের সত্যতার এক জীবন্ত নিদর্শন
দেখো খোদানে এক জাঁহাকো ঝুঁকা দিয়া [দেখো খোদা এক দুনিয়াকে ঝুঁকিয়ে দিলেন]
গুমনাম পাকে শোহরায়ে আলম বানা দিয়া [অপরিচিত পেয়ে জগতে প্রসিদ্ধ করলেন]

মূল ঃ মোকাররম জাবেদ আহমদ জাবেদ

খোদাতাআলার নবীরা সেই সময় পৃথিবীতে আসনে যখন পৃথিবীর অধিবাসীরা এক ও অদ্বিতীয় খোদার একত্বকে ভুলে অগণিত খোদার পূজারী হয়ে যায়। ভালবাসার পরিবর্তে হিংসার প্রসার হয়, মিলন ও একতার স্থলে মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা অঙ্কুরিত হয়। তখন আম্বিয়া আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌তাআলার আদেশে ও তাঁর সাহায্যে নিজেদের পবিত্র শিক্ষা ও সান্নিধ্যের দ্বারা পরস্পরের মাঝে ভালভাসা সৃষ্টি করেন। এসব অগণিত খোদার প্রার্থনার স্থলে এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের দিকে মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর এ চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী ও স্রষ্টা শান্তিদাতা খোদার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন যিনি সকল জগতের প্রভু। এ একত্ববাদের পূজারীগণ নিজেদের মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দূর করে এক পবিত্র, নিষ্পাপ ও মজবুত জামাত কায়েম করেন।

বর্তমান সময়ের মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ) যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেন তেমনি আল্লাহ্‌তাআলার সনাতন সুন্নত অনুসারে মতানৈক্যকে মিলন ও একতায় রূপান্তরকারী অস্তিত্বের আগাম খবরও দেন।

এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ানে আজ থেকে একশ' তেরো বছর আগে এ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ এসে এ মহৎ কাজের সূচনা করেন। প্রথম দিনেই ৪০ জন তাঁর হাতে বয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করে। এসব ব্যক্তিদের তিনি নিজ সান্নিধ্যে রেখে পবিত্র করেন। তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সংবাদে আকৃষ্ট হয়ে দূরের ও কাছের সত্যানুসন্ধানকারী হৃদয় কাদিয়ানে আসা শুরু করে। বয়াত করে এ পবিত্র জামাতে শামিল হয়। সব নবীরই তাঁর অনুসারীদের ঈমান, তাকওয়া এবং খোদা-প্রেমের উন্নতির চিন্তা থাকে। সে চিন্তাই বর্তমান সময়ের প্রতিশ্রুত পুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হৃদয়ে এক প্রচেষ্টার বীজ বপন করে। যাতে এরূপ উপলক্ষ্য সৃষ্টি হয়ে যে, বয়াত গ্রহণকারীরা বছরে কমপক্ষে কিছু দিন কাদিয়ানে এসে তাঁর সান্নিধ্যে থাকে এবং তাদের তাকওয়া ও পবিত্রতার উন্নতি হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

"এ সিলসিলার একনিষ্ঠ বয়াতকারীগণ যারা বাহ্যিকভাবে এ অধমের কাছে বয়াত নিয়েছেন, তাদের বয়াতের উদ্দেশ্য হ'ল যেন তাদের হৃদয়ে দুনিয়ার ভালবাসা ঠান্ডা হয় এবং আমাদের করুণাময় প্রভু ও রসূলে মকবুল (সঃ)-এর ভালবাসা হৃদয়কে জয় করে। অবস্থার এরূপ পরিবর্তন হয় যেন শেষ বিদায়কে ঘৃণিত বলে মনে না হয়। এ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য সান্নিধ্যে থাকা এবং নিজের জীবনের একটা অংশ এ পথে খরচ করা প্রয়োজন। যদি আল্লাহ্‌তাআলা চান তো কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ দেখার ফলে দুর্বলতা, ভালবাসা এবং উদাসীনতা দূর হয়ে হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও আশাব্যঞ্জক ভালবাসার সৃষ্টি হবে। সেজন্য এ বিষয় সব সময় চিন্তা করতে হবে যেন খোদাতাআলা এ তৌফীক দান করেন। আর যতদিন এ সাফল্য অর্জন করা না যায় ততদিন অবশ্যই কখনও কখনও আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। কারণ সিলসিলাহ্ বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দেখা করার জন্য মনোযোগী না হওয়ায় এরূপ বয়াত সম্পূর্ণরূপে আশীষশূন্য ও প্রথাসর্বস্ব হয়ে যায়। আর সকলের পক্ষে দুর্বল স্বাস্থ্য, আর্থিক অস্বচ্ছলতা অথবা দূরত্বের জন্য সহজ নয় যে, তারা ভালবাসার কারণে এখানে থাকে কিংবা বছরে কয়েক বার কষ্ট করে দেখা করার জন্য এখানে আসে। কারণ বেশির ভাগ হৃদয়ে এখনও এরূপ দৃঢ় ইচ্ছা সৃষ্টি হয় নি যে, সাক্ষাৎ করার জন্য বড় বড় দুঃখ কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করে। সেজন্য এটা যৌক্তিক মনে হয় যে, বছরে তিন দিন এরূপ জলসার ব্যবস্থা করা যাতে সকল একনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি খোদা চান সুস্থ শরীরে, নেতিবাচক প্রতিবন্ধকতা ছাড়া, অবসর সহকারে নির্দ্ধারিত তারিখে হাজির হতে পারে। আমার ধারণায় এটি ভাল হয় যে, ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারিখ ধার্য করা। আজকের দিনের পরে অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯১ এরপর যদি আমাদের জীবনে ২৭ ডিসেম্বর তারিখ আসে তবে সকল বন্ধুর কেবলমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার কথা শোনার জন্য এবং দোয়াতে অংশগ্রহণের জন্য এ তারিখে আসা উচিত। এ জলসাতে এরূপ সত্য ও জ্ঞানপূর্ণ কথা শোনার ব্যবস্থা থাকবে যা ঈমান ও একীন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন। আর সেই সকল বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও মনোযোগ থাকবে এবং সামর্থ্য অনুসারে পরম করুণাময়ের দরবারে দোয়া হবে যেন আল্লাহ্‌তাআলা নিজের দিকে তাদের আকৃষ্ট করেন। আর তারা যেন তাঁর কাছে গৃহীত হয় এবং নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনতে পারে। বাহ্যিকভাবে তাদের আরো একটি সুবিধা এ জলসাতে হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব ভাই এ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা নির্ধারিত তারিখে জলসায় উপস্থিত হয়ে তাদের পুরাতন ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন এবং পরিচিত হয়ে পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হবে। আর যেসব ভাই এ সময়ের মাঝে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে ইন্তেকাল করবেন তাদের মাগফেরাতের জন্য এ জলসাতে দোয়া করা হবে। সকল ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে এক করার জন্য এবং তাদের শুষ্কতা, স্বার্থপরতা ও কপটতাকে মাঝখান থেকে ওঠানোর

জন্য মহান আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে দোয়া করা হবে। এ আধ্যাত্মিক সিলসিলাহ্‌র আরও অনেক রূহানী সুবিধা আছে যা ইন্‌শাআল্লাহ্‌তাআলা সময় সময় প্রকাশ হবে। আর কম আয়ের বন্ধুদের উচিত হবে আগে থেকে জলসাতে উপস্থিত হওয়ার চিন্তা করা। আর চেষ্টা করে কিছু কিছু অর্থ সফরের খরচের জন্য প্রত্যেক দিন কিংবা প্রতি মাসে যদি জমা করা হয় কিংবা আলাদা করে রাখা হয় তবে ঠিক সময়ে ও সফরের খরচ মেটানো সহজ হবে। অর্থাৎ এ সফর বাড়তি খরচ ছাড়াই হয়ে যাবে। ভাল হয় যেসব বন্ধু এ পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তারা যেন এখন লিখিতভাবে জানান। তবে একটি পৃথক তালিকায় তাদের নাম সংরক্ষণ করা হবে। যারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করে নির্ধারিত তারিখে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য হাজির হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন। যদি এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, সফর করা নিজের সামর্থ্যের বাইরে সেসব ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সকলে নির্ধারিত সময়ে দৃঢ় চিত্তে ও সংকল্পে উপস্থিত হবেন। আজ ১৮৯১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ধর্মীয় পরামর্শের জন্য এ জলসা করা হয়েছে। যেসব বন্ধু কেবল মাত্র আল্লাহ্‌তাআলার জন্য কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন খোদা তাদের পুরস্কার দেবেন এবং প্রতি পদক্ষেপের জন্য তাদের পুণ্য দেবেন। আমীন, সুম্মা আমীন।

১৮৯২ সালের ৭ ডিসেম্বর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এক ইশতেহারে তাঁর পয়গাম ইউরোপ ও আমেরিকায় পৌছানোর নেক প্রচেষ্টা চালানোর এক প্রস্তাব পেশ করেন। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, "সকল নিষ্ঠাবান বন্ধুর খেদমতে জানাচ্ছি যে, ১৮৯২ সালের ২৭ ডিসেম্বর কাদিয়ানে এ অধমের অনুসারীদের এক জলসা অনুষ্ঠিত হবে। এ জলসার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য এই, যেন প্রত্যেক নিবেদিত ব্যক্তি তার সাধ্য অনুসারে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়। তারা যেন জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়। খোদাতাআলার দয়া ও অনুগ্রহে তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানও যেন বৃদ্ধি পায়। এ সমাবেশের আরও উপকারিতা হ'ল যে, এ সাক্ষাতের ফলে ভাইদের পরিচিতি বাড়বে এবং জগতের এ সম্বন্ধ ভ্রাতৃত্ব মজবুত হবে। এ ছাড়াও এ জলসার আরও উদ্দেশ্য হ'ল ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্মীয় সহানুভূতির জন্য নেক পরিকল্পনা তৈরী করা। কারণ এখন এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইউরোপ ও আমেরিকার ভাগ্যবান লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মের মাঝে মতভেদের জন্য তারা দোদুল্যমান ও নিরাশ। এ সময়ে আমার নামে এক ইংরেজের চিঠি আসে। তাতে তিনি লেখেন, আপনাদের সকল প্রাণীদের প্রতি মমতাবোধ আছে। আমিও মানুষ এবং মমতা পাওয়ার অধিকারী। আমিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি কিন্তু ইসলামের সত্যতা ও প্রকৃত শিক্ষা কী তা জানি না। সুতরাং ভাইয়েরা বুঝুন।

আমাদের জন্য এখানে জামাত হ'তে পারে। খোদাতাআলার কোন পবিত্র হৃদয়কে জামাত ছাড়া রাখেন না। নিশ্চয় সর্বশক্তিমান খোদা সত্যের বরকতে এসব হৃদয়কে এদিকে আকৃষ্ট করবেন। আল্লাহ্‌তাআলা আকাশে এটাই চেয়েছেন। আর কেউ নেই যে, এর পরিবর্তন করে।

এ জলসার সাথে কয়েকটি নেক কাজ সম্পৃক্ত। এ জলসায় যারা আসবেন তাদের যেন রাহা খরচের সামর্থ্য থাকে এবং নিজেদের শীতের পোষাক, বিছানাপত্র, লেপ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেন সাথে আনেন। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের রাস্তায় সামান্য সামান্য বাধাকে যেন পরওয়া না করেন। আল্লাহ্‌তাআলা নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের প্রতি পদক্ষেপে পুণ্য দেন এবং তার রাস্তায় কোন শ্রম ও কষ্টকে নষ্ট হতে দেন না। বারংবার লেখা হচ্ছে যে, এ জলসাকে সাধারণ মানুষের সমাবেশের মত মনে করো না। সেই আদেশের উপর ভিত্তি করে রাখা হয়েছে যাতে প্রকৃত সত্যকে গ্রহণের জন্য ও আল্লাহ্‌র দীনকে সবার কাছে তুলে ধরার জন্য বলা হয়েছে। এ জামাতের ভিত্তি প্রস্তর খোদাতাআলা নিজের হাতে রেখেছেন। আর এজন্য জাতিও সৃষ্টি করেছেন যারা সত্বর এসে মিলিত হবে। এটি এরূপ সর্বশক্তিমানের কাজ যার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। সেই সময় শীঘ্রই আসবে বস্তুত খুবই নিকটবর্তী। এ ধর্মে কোন প্রকৃতি প্রেমিকের চিহ্ন থাকবে না। এবং না প্রকৃতি অগ্রাহ্যকারীর। কল্পনা পূজারী বিরোধী থাকবে না কিংবা মু'জিযার অস্বীকারকারীরাও অবশিষ্ট থাকবে না। আর না এর মাঝে বেহুদা, কৃত্রিম কুরআনের বিরোধী আর মিথ্যা গল্প মেশানো ব্যক্তি থাকবে। খোদাতাআলা এ মধবর্তী উম্মতের জন্য মাঝামাঝি রাস্তা প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। সেই রাস্তা যা কুরআন এনেছে। সেই পথ যা রসূল করীম (সঃ) তাঁর সাহাবাদের (রাঃ) শিখিয়েছেন। সেই সত্যপথ (হেদায়াত) যা প্রথম থেকে সিদ্দীক, শহীদ, সালেহগণ (রাঃ) পেয়ে আসছেন। এটা হবেই অবশ্যই হবে। যার কান আছে সে শুনুক। পবিত্র সেইসব লোক যাদের কাছে সোজা রাস্তা খোলা আছে। শেষে দোয়ার সাথে শেষ করছি যে, সকলে যারা এই আল্লাহ্‌র জলসার জন্য সফরে বার হবেন খোদাতাআলা তাদের সাথে থাকবেন। আর তাদের বড় পুরস্কার দেবেন। তাদের উপর রহমত করবেন। অসুবিধা ও দুর্ভাবনার অবস্থাকে তাদের জন্য সহজ করে দেবেন, তাদের ভয় ও দুঃখকে দূর করবেন। তাদের সব দুঃখ থেকে রেহাই দেবেন, তাদের ইচ্ছার রাস্তা তাদের জন্য খুলে দেবেন, আর আখেরাতের দিন তিনি তাঁর এসব বান্দাকে তাঁদের সাথে উঠাবেন যার ওপর তাঁর আশিস ও কৃপা আছে। আর তার মৃত্যুর পর তার স্থানে তার প্রতিনিধি থাকবেন। হে খোদা, হে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দাতা, রহীম ও অসুবিধা দূরকারী খোদা! তুমি এ সকল দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরোধীদের উপর উজ্জ্বল নিদর্শনের দ্বারা আমাদেরকে জয়যুক্ত কর। সকল শক্তি ও ক্ষমতা তোমারই, আমীন, সুম্মা আমীন"।

নিজের হাতে বয়াতকারীদের পবিত্র সান্নিধ্যের সুযোগ দানের জন্য আর তাদের তাকওয়ার উন্নতিকল্পে যে কর্ম-পদ্ধতি তাঁর হৃদয়ে উদয় হয়, এর নাম তিনি সালানা জলসা রাখেন। এ জলসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি নিজের দু'টি বিজ্ঞাপনে তা বর্ণনা করেন যা আপনারা পড়লেন।

সালানা জলসার প্রভাব ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময় দ্বিতীয় সালানা জলসায় যোগদানকারী এক ব্যক্তির উপর এ জলসার যে প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কে তাঁর এক পুস্তক "আয়নায়ে কালামাতে ইসলামে" ছাপা হয়। পাঠকদের সন্তুষ্টির জন্য এখানে দেয়া হ'ল। এ প্রভাব পড়ে হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের ওপর। তিনি ১৮৯৩ সালের ২রা জানুয়ারী বর্ণনা করেন ঃ

"মির্যা সাহেব ভালভাবে জানতেন, আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁর বিরোধী ছিলাম। কেবল মাত্র বিরোধী নয়, বস্তুত কুধারণা ও প্রতারণার মত অবস্থা আমার সাথে হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে জলসাতে ডাকেন। কিছু চিঠি যার মাঝে একটি রেজিষ্টার্ড পাঠান। যদিও আমার অজ্ঞতা ও বিরোধিতার কারণে জলসায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মির্যা সাহেবের বার বার লেখার জন্য আমার মনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি খুব ভাল ব্যবহার করেন। তাতে আমার মন নরম হয়ে যায়। মির্যা সাহেবের চাহনিতে সুরমার সলাকা ছিল যাতে আমার মানস চোখের ধূলার আবরণ দূর হয়। আর আধ্যাত্মিক ক্রোধ ও গযবের সর্দি কাশির পানি শুকিয়ে কিছু কিছু আব্ছা আব্ছা সত্য চোখে পড়তে লাগে। ধীরে ধীরে গোপন অন্ধত্ব দূর হ'ল। মির্যা সাহেব ছাড়া আরও কোন কোন ভাই এ জলসাতে এরূপ ছিলেন যাদের আমি ঘৃণ্য ও বৈরী হিসাবে দেখতাম। এখন তাদের ভালবাসা আর অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলাম। এরূপ অবস্থা হ'ল যে, কাল জলসায় যারা মির্যা সাহেবের বেশি প্রিয় ছিল তারা আমারও খুব ভালবাসার পাত্র মনে হতে লাগলো। আসরের পরে মির্যা সাহেব কিছু বর্ণনা করেন। এ শোনার ফলে আমার সব সন্দেহ দূর হ'ল। আর চোখ খুলে গেল।

এ জলসায় তিনশ'রও বেশি ভদ্র ও নেক লোক সমবেত হয়, যাদের চেহারা থেকে মুসলমানী নূর টপটপ করে পড়ছিল। ধনী, দরিদ্র, নওয়াব, ইঞ্জিনিয়ার, দারোগা, তহশীলদার, জমিদার, ব্যবসায়ী, বিচারক অর্থাৎ সব স্তরের লোক ছিল। হ্যাঁ, কিছু মৌলভীও ছিল। মৌলভীদের সাথে দরিদ্র ও বিনীত শব্দ ব্যবহারই মির্যা সাহেবের কারামত। মির্যা সাহেবের সাক্ষাতে মৌলভীও বিনয়ী হয়ে যায়।

আল্লাহ্তাআল মির্যা সাহেবের এত উন্নতি দিয়েছেন। আর সৃষ্টিকর্তা খোদা সকলের মনযোগ এদিকে এরূপভাবে নিবদ্ধ করেছেন যে, নিজেদের সুখ ছেড়ে, বাড়ী থেকে পৃথক হয়ে, টাকা খরচ করে কাদিয়ানে এসে মাটির ওপর শুয়ে আছেন। সম্ভবত দু/এক রাত রেলে জেগে কাটিয়েছেন। অনেকে পায়ে হেঁটেও উপস্থিত হন। আমি একটা লোকের কাছ থেকেও কোন অভিযোগ শুনি নি। তারা মির্যা সাহেবের চারপাশে এরূপভাবে জমা হয়েছে যেন প্রদীপের চারপাশে পতঙ্গ। যখন মির্যা সাহেব কিছু বলেন তো তাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। পঞ্চাশ জন এ জলসায় শিক্ষা গ্রহণ করে।

মির্যা সাহেব পূর্ব পশ্চিমের সকল ইসলাম বিরোধীদের দাওয়াত দেন এবং এরূপ ভালবাসা দেখান যে, বিরোধিতার কোন অবকাশ থাকে না। বেশিরভাগ প্রকৃতিবাদী মৌলবীদের সাথে কখন মীমাংসায় আসতে পারে না। তারাও তওবা করেছে। পাঞ্জাব থেকে প্রকৃতিবাদীদের প্রভাব অনেক কমে গেছে। এসব প্রকৃতিবাদী যাদের মুসলমানদের মত চেহারা ছিল না তারাও মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের পর মু'মিন চরিত্রের হয়ে গেছে। কর্মচারী ও থানার দারোগা ঘুষ নেয়া বন্ধ করেছে। নেশাখোর নেশা ছেড়েছে। কিছু লোক হুক্কা খাওয়া বন্ধ করেছে। মির্যা সাহেবের শীয়া মুরীদরা তাদের জাতিকে ছেড়ে সাহাবাদের ভালবাসতে শুরু করেছে। তাজিয়া করা ও মর্সিয়া গাওয়া ছেড়েছে। ফুল থেকে গাছ চেনা যায়। লোকেরা আল্লাহ্তাআলাকে গুণের মাধ্যমেই চিনেছে। অন্যথায় তাঁর অস্তিত্বতো চর্মচক্ষে দেখা যায় না। (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)

সালানা জলসা আহমদীয়তের সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন ঃ

সালানা জলসার ভিত্তি কেন স্থাপন করা হয়েছে? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল? আর এর মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য কীভাবে হাসিল করা যাবে? এ প্রেক্ষিতে আমরা দেখবো যে, এ জলসা আহমদীয়তের সত্যতার নিদর্শন কীভাবে হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আমরা খোদাতাআলার সে বাণীকে নিরীক্ষণ করবো যা তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর বহু পূর্বে তাঁর কাছে নাযেল করেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

"আর যেসব রাস্তা দিয়ে সেসব আর্থিক সাহায্য ও আকাঙ্ক্ষার চিঠিপত্র আসবে সে সব রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবে ও গভীর গর্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ সব রকমের সম্পদ প্রচুর পরিমাণে আসবে এবং দূর থেকে আসবে। বহুদূর থেকে অনুসারীদের চিঠিপত্র আসবে। আর প্রচুর সংখ্যায় এত বেশি লোক আসবে যে, যেসব রাস্তা দিয়ে আসবে সেগুলোতে গভীর গর্ত হয়ে যাবে। খোদাতাআলা নিজের পক্ষ থেকে তোমার সাহায্য করবেন। তোমার সাহায্য সেসব লোক করবে যাদের হৃদয়ে আমি নিজে আকাশ থেকে ইলহাম করবো। মনে রেখো, সে যুগ আসছে যে সময় লোকেরা অগণিত সংখ্যায় তোমার দিকে মনোনিবেশ করবে। তোমার ওপর অবশ্যই পালনীয় যে, তুমি তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। তোমার জন্য আবশ্যকীয় যে, সংখ্যা দেখে তুমি ক্লান্ত হয়ো না (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড)।

সালানা জলসার বিস্তৃতি

আল্লাহ্তাআলার এ বাণী যা ভবিষ্যদ্বাণী ও উপদেশ আকারে নাযেল করা হয়েছে। এ থেকে দিবালোকের মত প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্তাআলা নিজের হাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দাঁড় করিয়েছেন এবং তাঁকে সার্বক্ষণিক সাহায্য করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্তাআলার এ প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন প্রথম সালানা জলসা করেন তখন ৭৫ ব্যক্তি হুযূর (আঃ)-এর আহবানে কাদিয়ানে আসেন। এরপর বছর ৩২৭ জন সালানা জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের শেষ সালানা জলসায় উপস্থিতি ২০০০ পর্যন্ত হয়। এরপর ১ম খলীফা হযরত হাকিম হাফেয

মাওলানা নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর শেষ সালানা জলসায় যোগদানকারীর সংখ্যা ছিল তিন হাজারের বেশি। ২য় খলীফা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর শেষ সালানা জলসায় উপস্থিত সংখ্যা ছিল ১ লাখের থেকে বেশি। হযরত খলীফা সালেস (রাহেঃ)-এর সময় তাঁর শেষ জলসায় লোক সংখ্যা ছিল দু' লাখেরও বেশি। এ জলসা ১৯৮১ সনে রাবওয়াতে হয়। হযরত খলীফা রাবে' (রাহেঃ)-এর সময়ে রাবওয়াতে তাঁর শেষ সালানা জলসা হয় ১৯৮৩ সনে। এতে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল আড়াই লাখের বেশি।

সালানা জলসার আন্তর্জাতিক মান ঃ

হযরত খলীফা রাবে' (রাহেঃ)-এর লন্ডনে আসার পর থেকে সালানা জলসা খুবই বিস্তৃতি লাভ করে। এর থেকে উপকার লাভের জন্য প্রতি দেশে এ জলসার ব্যবস্থা করা হয় এবং এর থেকে বরকত লাভ করা হয়। উপ-মহাদেশ ভাগের আগে (১৯৪৭) কাদিয়ানের ১৯৮৬ সালের সালানা জলসায় উপস্থিত ছিল ৩৯,৭০০ জন। আর গত বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় ৪৮ হাজার ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন। নও মোবায়েঈনের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। হিন্দু ও শিখ ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তি, পাঞ্জাব সরকারের মন্ত্রী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে।

গত বছর ২০০১ ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র জার্মানীতে অনুষ্ঠিত জলসায় ১৭৬টি দেশ থেকে ৩৭ হাজারের বেশি লোক অংশ গ্রহণ করে। এরূপে ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা এবং কেনাডার সালানা জলসায় হাজার হাজার লোক যোগদান করে (উল্লেখ্য, এ বছর অর্থাৎ ২০০২ সালে ইউরোপে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৩৬তম সালানা জলসায় ৭৪টি দেশ থেকে ১৯ হাজার ৪০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করে - অনুবাদক)

এসব জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে আহমদীয়তের সত্যতার ওপর মোহর মেরে দিচ্ছে। পাঠকগণ ১৮৯১ হতে ১৯৮৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জলসার উপস্থিতির দিকে লক্ষ্য করুন। এসব জলসাতে যোগদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি আহমদীয়তের সত্যতা প্রমাণ করেছে এবং এখনও করছে। এসব মাহাত্ম্যপূর্ণ সান্নিধ্য যোগদানকারীদের প্রত্যেকের ঈমানের উন্নতি ও তাওকয়ার বৃদ্ধি হয়েছে। আর ঈমানবর্ধক ঘটনাকে সারা বছর হৃদয়ে জীবন্ত রাখে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর সময় থেকে আহমদীয়া জামাতের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তৃতি ঘটে। আর সালানা জলসা আন্তর্জাতিকরূপ লাভ করে। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ব্যতীত ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক দেশের অধিবাসীরাও সালানা জলসায় অংশ গ্রহণ শুরু করে। হযরত খলীফা সালেস (রাহেঃ) -এর মোবারক সময় হতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বিদেশীরা অধিক সংখ্যায় সালানা জলসায় অংশ গ্রহণ করতে থাকে। আজ পর্যন্ত অনেক দেশের অসংখ্য লোক এ সালানা জলসায় যোগদান করেছে।

পাঠকের মনোযোগের উপযোগী ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ উদ্দেশ্যে আয়নায়ে কামালাতে ইসলামে লেখেন যে, 'এ কথা বোঝা উচিত যে, মানুষ নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে খোদার কাজকে বন্ধ করতে পারে না। এ ঘটনা খুবই সান্ত্বনাদায়ক যে, গত বছর যখন মিঁয়া বাটলভী সাহেবের কাফিরের ফতোয়া তৈরী হয় নি। আর তিনি কোন বড় ধরনের প্রচেষ্টা বা জীবন-মরণ পণ করে এ অধমকে কাফির সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে নি, তখন কেবল মাত্র ৭৫ জন একনিষ্ঠ ব্যক্তি কাদিয়ানের জলসাতে এসেছে। কিন্তু এখন যখন ফতওয়া তৈরি হয়ে গেছে বাটালবী তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে এবং প্রত্যেক দিন কষ্ট স্বীকার করে তার সমমনা আলেমদের দ্বারা এ ফতোয়ার ওপর মোহর লাগিয়েছেন। তিনি আর তার আলেমরা খুব অহংকার ও আনন্দের সাথে এ বিষয়ে একমত হন যে, এখন তারা আল্লাহ্‌র এ সিলসিলাহ্‌র উন্নতির পথে বড় বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। এ বছর সালানা জলসাতে ৭৫ জনের পরিবর্তে ৩২৭ জন অংশগ্রহণ করেন। আর এরূপ ব্যক্তিরাও আসে যারা তওবা করে বয়াত নেয়। এখন চিন্তা করা উচিত, এটা কি খোদাতাআলার মহান কুদরতের একটা নিদর্শন নয় যে, বাটালভী ও তার সমচিন্তার আলেমদের চেষ্টার বিপরীত ফল হ'ল। আর তাদের সব চেষ্টা বেকার হ'ল। এটা কি খোদাতাআলার অনুগ্রহ নয় যে, মিঁয়া বাটালভীর হিন্দুস্থানে ঘুরতে ঘুরতে পা ক্ষয়ে গেল কিন্তু পরিণতির মালিক খোদাতাআলা তাকে দেখিয়ে দিলেন যে, কীরূপে তাঁর সিদ্ধান্ত মানুষের ওপর জয়যুক্ত হয়" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

আল্লাহ্‌তাআলার যেসব কুদরতের দ্যুতি প্রকাশের উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনায় বলেন, সালানা জলসা খোদার কুদরতের মহান নিদর্শন। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জলসা আহমদীয়তের সত্যতার উপর মোহর মেরে প্রমাণ করেছে যে, এর মাধ্যমে খোদাতাআলার সমর্থন ও সাহায্য প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে দলে দলে লোক এসব জলসাতে সমবেত হওয়ার জন্য দৌড়ে চলে আসছে। এসব জলসার মাঝে সেসব জলসা কেন্দ্রীয় জলসার মর্যাদা পায় যাতে হযরত খলীফা মসীহ্ (আইঃ) যোগদান করেন। তাঁর বক্তৃতা ও সাক্ষাতে জলসায় যোগদানকারীরা নিজেদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্তি করে। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার লাখো লাখো শুকরিয়া করছি যিনি প্রতি সালানা জলসায় তাঁর কুদরতের বিকাশ আমাদের দেখান ও দেখাচ্ছেন। এখন এমটিএ-এর সাহায্যে এ জলসা আন্তর্জাতিকরূপ লাভ করেছে। প্রতিবছর কোটি কোটি আধ্যাত্মিক পিপাসু ব্যক্তি এ সুমিষ্ট ঝরণা থেকে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে।

"কুদরত সে আপনি জাত কা দেতা হ্যায় হক সুবুত
জিস বাত কো কাহে কে করুঙ্গা এ ম্যায় যবর।
ইস বে নিসাঁ কি চেহারা নোমায়ী এহি তো হ্যা
টলতি নেহী ও বাত খোদায়ী এহী তো হ্যা॥

অনুবাদ ঃ কওসার আলী মোল্লা

এসো কুরআন শিখি

(১২তম কিস্তি)

আয়াত নং ৮৫ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া ইযআখাজনা - এবং যখন আমরা নিয়েছিলাম, **মীসাক্বাকুম** - তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ়-অঙ্গীকার, **লা তাসফিকূনা দিমা-য়াকুম** - তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না, **ওয়ালা তুখরিজূনা** - এবং তোমরা বের করে দেবে না, **আনফুসিকুম** - নিজেদেরকে বা নিজেদের লোকদেরকে, **মিন্ দিয়া-রিকুম** - তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে, **সুম্মা আক্বরারতুম** - এরপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে, **ওয়া আনতুম তাশহাদূন** -এবং তোমরাই এর সাক্ষী রয়েছো।

অনুবাদ ঃ এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ়-অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না, এবং তোমাদের লোকদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেবে না, এরপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরাই এর সাক্ষী।

আয়াত নং ৮৬ ঃ

শব্দার্থ ঃ সুম্মা আনতুম - তথাপি তোমরা, **হা-উলা-ই**-এরাই,**তাক্বতুলূনা আনফুসাকুম** - নিজেদের লোকদেরকে হত্যা করে থাকো, **ওয়াতুখরিজূনা**-আর বের করে থাকো, **ফারীক্বাম্মিকুম** - তোমাদের এক দলকে, **মিন দিয়া-রিহিম** - তাদের বাড়ী-ঘর থেকে, **তাযা-হারূনা 'আলায়হিম** - তাদের বিরুদ্ধে একে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছো, **বিল ইস্‌মি ওয়াল 'উদওয়ান** - পাপ ও সীমালঙ্ঘন করে, **ওয়া ইয়্যা'তুকুম** - পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাদের কাছে আসে, **উসা-রা** - বন্দী হয়ে, **তুফাদূহুম** - তোমরা তাদেরকে বিনিময় মূল্য দিয়ে উদ্ধার করে থাকো, **ওয়া হুয়া মুহার্‌রামুন 'আলায়কুম** - অথচ তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল, **ইখরাজুহুম** - তাদেরকে বের করে দেয়া, **আফাতু'মিনূনা** - তবে কি তোমরা বিশ্বাস কর, **বিবা'যিল কিতাব** - কিতাবের এক অংশ, **ওয়া তাকফুরূনা বিবা'য** - এবং তোমরা অস্বীকার কর অপর অংশ, **ফামা-জাযা-উ** - অতএব কী প্রতিফল হতে পারে? **মাঁইয়াফ'আলু যালিকা মিনকুম** - তোমাদের যারা এরূপ কাজ করে, **ইল্লা খিযইয়্যুন ফিল হায়াতিদ্দুনয়া** - ইহ-জীবনের লাঞ্ছনা ছাড়া, **ওয়া ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ্** - আর কিয়ামত দিবস, **ইউরাদ্দূনা** - তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, **ইলা আশাদ্দিল 'আযা-ব**-কঠোর শাস্তির দিকে, **ওয়ামাল্লাহু** - আর আল্লাহ্ নন, **বিগাফিলিন** - অনবহিত, **'আম্মা তা'মালূন** - তোমরা যা কর।

অনুবাদ ঃ তথাপি তোমরাই নিজেদের লোকদেরকে হত্যা করে থাকো আর তোমাদের একদলকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে থাকো, তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের বিরুদ্ধে একে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছো, পক্ষান্তরে তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে তখন তোমরা তাদেরকে বিনিময় মূল্য দিয়ে উদ্ধার করে থাকো। অথচ তাদেরকে বের করে দেয়াই তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশে বিশ্বাস কর ও অপর অংশকে অস্বীকার কর?

অতএব তোমাদের যারা এরূপ কাজ করে তাদের জন্যে ইহজীবনের লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী প্রতিফল হতে পারে? আর কিয়ামত দিবসে তাদেরকে এর চেয়েও কঠোর শাস্তির দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে অনবহিত নন।

আয়াত নং ৮৭ ঃ

শব্দার্থ ঃ উলা-ইকাল্লাযীনা - এরাই, **ইশতারাও**-ক্রয় করেছে, **আল্ হায়াতাদ্দুনয়া** - ইহজীবনকে, **বিল আখিরাতি** - পরজীবনের বিনিময়ে, **ফালা ইউখাফফাফু** - সুতরাং লাঘব করা হবে না, **'আনহুমুল 'আযাব** - তাদের শাস্তি, **ওয়া লা-হুম** - এবং তাদেরকে হবে না, **ইউনসারূন** - সাহায্য করা হবে।

অনুবাদ ঃ এরাই পরজীবনের বিনিময়ে ইহজীবনকে ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

আয়াত নং ৮৮ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া লাক্বদ আ-তায়না - আর নিশ্চয় আমরা দিয়েছি, **আল্ কিতা-ব**-কিতাব, **মূসা** - মূসা, **ওয়া কাফ্‌ফায়না** - এবং আমরা পাঠিয়েছি, **মিম্‌বা'দিহী** - তার পরে, **বির্‌রুসুল** - পর্যায়ক্রমে রসূল, **ওয়া আ-তায়না ঈসাব্‌না মারইয়ামা** - এবং ঈসা ইবনে মরিয়মকে দিয়েছি, **আল্ বায়্যিনা-ত** - সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, **ওয়া আয়্যাদনা-হু** - আর তাকে সাহায্য করেছি, **বিরূহিল কুদুস** - রূহুল কুদুস বা জিব্রাঈল দিয়ে, **আফাকুল্লামা - জায়াকুম** - তবে কি যখন তোমাদের নিকট আসে? **রসূলুন** - কোন রসূল, **বিমা-লা-তাহ্‌ওয়া** - যা মনঃপুত হয় না, **আনফুসুকুম** - তোমাদের, **ইসতাকবারতুম** - তোমরা অহংকার করবে, **ফা ফারীক্বান কায্‌যাবতুম** - ও তাদের একাংশকে প্রত্যাখ্যান করবে, **ওয়া ফারীক্বান তাক্বতুলূন** - আর একাংশকে হত্যা করবে।

অনুবাদ ঃ আর নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি ও তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি এবং ঈসা ইবনে মরিয়মকে আমরা সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী দিয়েছি আর রূহুল কুদুস দিয়ে তাকে সাহায্য করেছি; তবে কি যখনই তোমাদের নিকট কোন রসূল এমন কিছু নিয়ে আসে যা তোমাদের মনঃপুত হয় না তখনই তোমরা অহংকার করবে ও তাদের একাংশকে প্রত্যাখ্যান করবে আর একাংশকে হত্যা করবে?

আয়াত নং ৮৯ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া ক্বালূ - এবং তারা বললো, **কুলুবুনা গুলফুন** - আমাদের হৃদয় পর্দাবৃত, **বাল্ লাআনাহুমুল্লাহু** - না, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন, **বিকুফরিহিম** - তাদের অস্বীকারের কারণে, **ফা ক্বালীলাম্মা-ইউ' মিনূন** - অতএব তারা ঈমান আনে না বল্লেই চলে।

অনুবাদ ঃ এবং তারা বললো, 'আমাদের হৃদয় পর্দাবৃত', না, প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্বীকারের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। অতএব তারা ঈমান আনে না বল্লেই চলে। (চলবে)

সংকলন - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

পুণ্য-গাঁথা

কোথায় চৌধুরী আবুল হাসেম খান
খান বাহাদুর,
অর্ধশতাব্দী কাটিয়ে গেল চলে
সে তো নহে বহু দূর।
তব স্মৃতি বয়ে চলেছে
বক্সিবাজার আঞ্জুমান।
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

তব পরশে বাংলার জামাত
হয়েছিল সঞ্জীবিত,
তবলীগের তরে নিজেদের
করেছিল উৎসর্গীত।
মোদের ফখর তুমি ছিলে
বাংলার সন্তান।
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

দেখেছি তোমায় ছুটে যেতে
তবলীগ সফরে,
সাহাবীর মত ঘুরে ঘুরে
দূরে গ্রামান্তরে।
বাংলার মাটি খুঁজে তোমায়
হে নিবেদিত প্রাণ!
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

ধনী হয়েও গরীবের মত
ছিলে বিলাসহীন,
সাদা রুটি এক তরকারী
খাদ্য দৈনন্দিন।
জিহাদে কবীরের তুমি ছিলে
এক নেতা মহান।
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

ছিলে বাংলার জমাতে
আহমদীয়ার বরেণ্য আমীর,
তালাশ করি' সারা ভুবনে
পাইনাক তব নজীর।
তোমার তুলনা তুমি ছিলে,
সব যুগে মহান।
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

চলে গিয়েছিলে কাদিয়ান
হিজরত করে
বাংলার মাটি তোমায়
বৃথাই খুঁজে মরে।
সমীরণ মৃদু প্রবাহে তোমায়
করে অনুসন্ধান।
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

বিবির মৃত্যুর পর তার পাওনা
মোহরানা গণিয়ে,
শ্বাশুড়ীর পাওনা পাঁচশত টাকা
দিলেন পাঠিয়ে
বলেন তিনি, "মানুষ থাকিলে
এক আবুল হাসেম খান।"
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

চৌধুরী আব্দুল মতীনকে
খান বাহাদুর দেন দাওয়াত,
গিয়ে দেখেন, আশ্চর্য
তিনি করছেন অশ্রুপাত।
ভেবে পান না কেন
তিনি হয়েছেন সজল নয়ন।
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

বলেন, "একটি যুবক এসেছিল
তাঁর দ্বারে ভিক্ষার তরে,
'সুস্থ তুমি, কাজ না করে ভিখ
কেন মাগ ঘরে ঘরে' ?
'গেল সে চলে, কথা না বলে
মৌন করি মুখমন্ডল।"
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

"এ কী করিলাম, সায়েলকে দিলাম
এভাবে হাঁকিয়ে
মোর নবী কভু কোন প্রত্যাশীকে
দেন নাই তাড়িয়ে।
সায়েল দিও না তাড়ি',
খোদার বাণী করিলাম
প্রত্যাখান।"
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

খুঁজিলাম তাকে কাদিয়ানের
অলিতে গলিতে কত,
পেলাম না তাঁকে, তাই
হৃদয় দুঃখ জরাক্রান্ত।
হাশরের মাঝে খোদার কাছে
কী উত্তর করিব দান।
কোথায় সেই আহমদী ... সত্যদ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।

তব যুগে আহমদীগণ
খোদার ডাকে আত্মাহারা,
শত নির্যাতনে হ'ত না
কভু ধৈর্য হারা।
দিলে ঈমান তুমি
তাদের পাশে দন্ডায়মান।

মৃত্যুর শয্যায় করছিলেন
তিনি শুধু আহাজারি,
তোমার কোলে নিয়ে যাও
প্রভো যত পার তাড়াতাড়ি।"
মুফতী সাহেব পেলেন বাশারত
তার তরে 'গুফরান।'

- মির্যা আলী আকন্দ

আরাধনা

আবার বীণা বাজাও প্রভু তোমার প্রেমের গানে,
আমার আমি মগন ক'র তোমার জ্ঞানের ধ্যানে।

জীবন শিখায় জ্বালাও তুমি তোমার নূরের জ্যোতিঃ
দেখাও মোরে সে পথ, যে পথ তোমার প্রিয়জনের প্রতি।

শীতল পানির ধারায় আমার বক্ষ কর স্বচ্ছ-সবল,
পুষ্প পাতায় ফুল ও ফলে, সাজাও উহার কূল।

ফুল শাখাতে আসতে অলি, না পায় যেন বাঁধা
উদার রাখ হৃদয় আমার, তেমনি ক'রে সদা।

সৃষ্টি নিচয় দেখার মত চোখ কর মোর তীক্ষ্ণ-সবল
সাগর তলে নীল আকাশে আরো দূরে পড়ুক পলক।

আধাঁর রাতে চলতে যেন, তোমার প্রদীপ দেখায় আলো,
কাঁটার বনে চলার মত, তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি জ্বালো।

এই ধরাতে জীবন আমার সাজাও ফুল ও সজীব ফলে,
পরপারের জীবন যে হয়, ঠিক ইহারই অনুকূলে।

প্রজাপতির পাখায় যেমন, রং লেগেছে তোমার তুলির,
উহাই খানিক দাও বুলিয়ে, পাঁপড়িতে মোর জীবন কলির।

তোমার পরশ পাব আমি এইতো আমার সান্ত্বনা
তেমনি বোঝা দাও কাঁধে মোর, সইতে কেবল পারব যাহা।

চাইবো কি গো তোমার কাছে শুধুই যে হয় ভুল,
সাজাও তুমি কুটির মম যেমনি তোমার মননশীল।

এত কিছু নাই বা দিলে, মান নাহি মোর ইহার তরে,
আমায় তুমি দাও তোমারে আমার বক্ষ ভরে।

- আবুল হাসান

মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা

আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১১ ও ১২ই ডিসেম্বর, ২০০৩ইং রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়িয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে বগুড়া-রাজশাহী জেলা মজলিসের ১ম আঞ্চলিক বার্ষিক ইজতেমা ২০০৩ইং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

১১/১২/২০০৩ইং বৃহস্পতিবার মাগরিব ও ইশা জমার পর উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মাহবুব আজম রেজা, কায়েদ উমুমী ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুস সাত্তার মাষ্টার (যয়ীম, পাবনা) আহাদ-নামা পাঠ করেন জনাব রিজিওনাল নাযেম। সুললিত কণ্ঠে নযম পাঠ করেন জনাব আহমদ আলী আফরাদ ও উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন রিজিওনাল নাযেম জনাব প্রফেসর রাজিব উদ্দিন আহমদ। তরবিয়তী বক্তব্য পেশ করি খাকসার। নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন যয়ীম তেবাড়িয়া, আব্দুস সালাম।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর বিভিন্ন মজলিস হতে আগত যয়ীম ও আনসারদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় যয়ীম আব্দুস সালাম সাহেব। যয়ীম ও আনসারদের নিকট নিজ নিজ মজলিসের রিপোর্ট নেয়া হয়। এরপর এ বছরের বাকি কাজ ও আগামী বছরের প্রাথমিক কাজের উপর আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কায়েদে উমুমী। সেহতে জিসমানি বিষয়ক আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কায়েদে সেহতে জিসমানি।

১২/১২/০৩ইং রোজ শুক্রবার, রাত ৪টা ৩০ মিনিটে তাহাজ্জদ নামায পড়ান স্থানীয় মোয়াল্লেম নঈম আহমদ সাহেব। বাদ ফজর হতে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, ধর্মীয় জ্ঞানের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, কুইজ, পয়গাম রেসানী, স্মৃতি-শক্তি পরীক্ষা ও বল নিক্ষেপ বিষয়ক প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। প্রতিযোগিতার বিচারকমন্ডলী হিসাবে সর্বজনাব নঈম আহমদ, মোজাফ্‌ফর আহমদ, ফরহাদ হোসেন, মোয়াল্লেমগণ ও খাকসার দায়িত্ব পালন করি। বাদ জুমুআ ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কায়েদ উমুমী। কুরআন তেলাওয়াত করেন ১ম স্থান অধিকারী আব্দুল জব্বার, যয়ীম পুরুলিয়া। নযম পাঠ করেন প্রথম স্থান অধিকারী আহমদ আলী আফ্রাদ। সমাপনি ভাষণ দেন সভাপতি সাহেব। পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট তেবাড়িয়া। সর্বশেষে সভাপতি সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য, ইজতেমায় তেবাড়িয়া, কাফুরিয়া, পুরুলিয়া মেরীগাছা ও পাবনা হতে জেরে তবলীগ মেহমান সহ মোট ৪২জন অংশ গ্রহণ করেন।

- মোহাম্মদ আমীর হোসেন
মোয়াল্লেম ও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়িয়া, নাটোর

সন্তান লাভ

০৮ ডিসেম্বর ২০০৩ইং রোজ সোমবার ভোর সাড়ে চারটার সময় মহান আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ কৃপায় আমরা একজন পুত্র সন্তান লাভ করেছি, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। নবজাতক ও তার মা সুস্থ আছেন। নবজাতক তাহ্‌রীকে ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত। তার সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, নেক সালেহ্‌ ও খাদেমে দীন হবার জন্য জামাতের সকলের নিকট খাস দোয়া কামনা করছি।

- শাহ্‌ আলম খান
মোয়াল্লেম

শীত বস্ত্র বিতরণ

গত ১৫ই ডিসেম্বর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুরের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের হাড় কাঁপানো শীতে শীতার্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এক বস্তা শীতবস্ত্র নিয়ে আমাদের নাযেম জনাব কাওসার আলম সাহেব উত্তরবঙ্গে (পঞ্চগড়) পৌছান এবং গত ১৬/১২/০৩ইং উক্ত শীতবস্ত্র শীতার্তদের মাঝে বিতরণ করেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

- মীর ওয়াজেদ আলী, কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মীরপুর

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদার বছরের ৬ মাস অতিক্রান্ত। এখনও যারা ২০০৩-০৪ বছরের চাঁদা আদায় করেন নি তাঁদেরকে সত্বর চাঁদা আদায় করার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যারা স্থানীয় জামাতে চাঁদা দেন তাদেরকে রশিদের একটি ফটো কপি জলসায় আসার সময়ে সাথে নিয়ে আসার অনুরোধ করা যাচ্ছে। নচেৎ অফিস তাদের চাঁদার ব্যাপারে অনবহিত থাকার কারণে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না। চাঁদা আদায়ের খবর কেন্দ্রীয় অফিসে আসে অনেক পরে। স্থানীয় জামাতের দৃষ্টিও এ দিকে আকর্ষণ করা যাচ্ছে। তারাও যেন অর্থ বিভাগে চাঁদার রশিদ পাঠানোর সাথে সাথে অত্র অফিসে প্রত্যেক মাসের চাঁদা দাতার একটি তালিকা প্রেরণ করে আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন।

- নির্বাহী সম্পাদক

ওয়াকফে নও মোজাহিদের সাথে পরিচিত হোন

ছবিতে ঃ নানার কোলে ওয়াকফে নও শিশু।
নাম ঃ **কায়সার আহমদ** নম্বর ৯০৮৬ বি
বয়স- ৬ মাস ১৫দিন।
পিতা ঃ সোহেল আহমদ ভূঁইয়া
মাতা ঃ মাসরেকা সুলতানা
দাদা ঃ পীর মোহাম্মদ ভূঁইয়া
নানা ঃ আলহাজ্জ শেখ মোশাররফ হোসেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের ২৭তম বার্ষিক ইজতেমা শূরা ও দাঈআনে ইলাল্লাহ্ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত ঃ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর ২৭তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ২৩শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার, ২০০৩ইং তারিখে আল্লাহ্‌র ফযলে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ৩২টি স্থানীয় মজলিস থেকে মোট ৫৭০ জন সদস্যা কেন্দ্রীয় ইজতেমায় যোগদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন মোহতরেমা মাকসুদা রহমান সাহেবা, সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্। মোহতারেমা মাসুদা সামাদ সাহেবা এবং মিসেস সামিয়া তারেক, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ এতে উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আহাদনামা পাঠ করান সদর সাহেবা। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এবং ২০০৩ সনের সাধারণ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন মিসেস হোসনে আরা তাসাদ্দক। বার্ষিক অর্থ রিপোর্ট পাঠ করেন মিসেস মরিয়ম সুলতানা। 'বিজয়ের পূর্ব শর্ত' বিষয়ে প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন মিসেস মুখতার বানু। আহমদী মায়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সন্তানের উপর এর প্রভাব, তরবীয়তের গুরুত্ব, আহমদীয়া জামাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য, বাংলাদেশের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইতিহাস, তরবীয়তে আওলাদ (উর্দূ), হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রসঙ্গে কবিতা পাঠ করেন ও নযম পাঠ করেন (১) মিসেস মাকসুদা রহমান, সদর সাহেবা, (২) মিসেস হোসনে আরা তাসাদ্দক, (৩) আনোয়ারা সিকদার, (৪) মিসেস আনোয়ারা মুস্তাফিজ, (৫) মিসেস হামিদা শাকুর, (৬) নাজমা আফরিন, (৭) আসেফা খাতুন।

বিভিন্ন জামাত থেকে আগত লাজনা সংগঠনের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও প্রতিনিধিগণ তাদের পরিচিতি প্রদান করেন। এরপর ধর্মীয় জ্ঞানের উপর কুইজ প্রতিযোগিতা হয় লাজনা ও নাসেরাতের খেলাধূলাও হয় লাজনা ও নাসেরাত বোনদের। সবশেষে ধর্মীয় পুস্তকের উপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার উপর সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভানেত্রীর ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্য সমাপ্ত হয়। ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী লাজনা সংগঠনগুলির নাম ঃ (১) ঢাকা, (২) মীরপুর, (৩) তেজগাঁও, (৪) নারায়ণগঞ্জ, (৫) ফতুল্লা, (৬) গাজীপুর, (৭) চট্টগ্রাম, (৮) ক্রোড়া, (৯) ডোহাভা, (১০) ঘাটুরা, (১১) সৈয়দপুর, (১২) চরসিন্দুর, (১৩) নরসিংদী, (১৪) বি-বাড়ীয়া, (১৫) বানিয়াজান, (১৬) ঈশ্বরদী, (১৭) পঞ্চগড়, (১৮) বাহেরচর, (১৯) রাজশাহী, (২০) পটুয়াখালী, (২১) হেলেঞ্চাকুড়ি, (২২) মুন্সীগঞ্জ, (২৩) ফতুল্লা, (২৪) খুলনা, (২৫) তারুয়া, (২৬) সুন্দরবন, (২৭) আহমদনগর, (২৮) দূর্গারামপুর, (২৯) সিরাজগঞ্জ, (৩০) রংপুর ও (৩১) ময়মনসিংহ।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর ১০ম মজলিসে শূরা ২৪শে ডিসেম্বর, ২০০৩

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ১০ম শূরার অনুষ্ঠান শুরু হয়। হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দেন ও দোয়া করান এবং তিনি উক্ত শূরা পরিচালনা করেন। শূরায় ৩২টি মজলিস থেকে ৬৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

৬ষ্ঠ দাঈআনে ইলাল্লাহ্ ট্রেনিং প্রোগ্রাম ২৫শে ডিসেম্বর ২০০৩ ঃ

ভোর ৪টা ব্যক্তিগত তাহাজ্জুদের মাধ্যমে এ ট্রেনিং ক্লাস শুরু হয়, ফজরের নামাযের পর কুরআন তেলাওয়াত করে মিসেস নাসিরা সাদেক। এতে **তরজমাতুল কুরআন, হাদীসের আলোকে খতমে নবুয়ত, সাদাকাতে মসীহ্ (আঃ), ওফাতে ঈসা (আঃ), তবলীগের পদ্ধতি, উম্মতি নবী, আখেরী যামানার আলামত, তবলীগে হেদায়াত** ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ।

উক্ত দাঈআনে ইলাল্লাহ্ ট্রেনিং প্রোগ্রামে ৩২টি মজলিস থেকে ১১২ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

- হোসনে আরা তাসাদ্দক
জেনারেল সেক্রেটারী
লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ

নবী নেতা পুস্তক সংগ্রহ করুন

নবী নেতা পুস্তকখানা পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। এটা নবী করীম (সঃ)-এর একখানা গবেষণামূলক সীরাত গ্রন্থ। এ পুস্তক খানা প্রণয়ন করেছেন হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান। প্রত্যেক আহমদীর নিজস্ব একখানা কপি থাকা আবশ্যক। এর বিনিময়মূল্য মাত্র ৫০/- টাকা। কেন্দ্রীয় আহমদীয়া লাইব্রেরী থেকে এ মূল্যবান পুস্তকখানা সংগ্রহ করুন।

- সেক্রেটারী প্রকাশনা

শুভ বিবাহ

❑জনাব মোঃ ফজলুর রহমান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নুছরত জাহান কণিকা, সাং- ১/৮০১, ইষ্টার্ণ পার্ল গ্রীন, ৭৩ গ্রীন রোড, ঢাকা -এর বিয়ে জনাব মুহাম্মদ আজহার আলী খান, -এর পুত্র জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন খান মাহমুদ, সাং- ৬৪/১০, দৌলত মুন্সী রোড, বাঘমারা, জেলা- ময়মনসিংহ-এর সাথে ১,৫০,০০১/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৩/৯/০৩ তারিখ, রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়,আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৯১/০৩, তারিখ ২৯/১০/০৩।

❑জনাব ইসহাক মিয়া-এর কন্যা মোসাম্মাৎ শিউলী আক্তার, সাং- মৌড়াইল, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিয়ে জনাব মতি মিয়া-এর পুত্র জনাব হাদিস মিয়া, সাং- কালিসীমা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে ৬০,০০০/= (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৫/৯/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের আমীর সাহেবের গৃহাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়,আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব শফিউল আলম বরকত, পিতা- মরহুম আব্দুল হাকিম, দক্ষিণ আহমদী পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

শুভ বিবাহ

ন্যাশনাল রিশতানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৯২/০৩, তারিখ ১২/১১/০৩।

❑ জনাব মাহ্মুদুর রহমান মোল্লা-এর কন্যা মোসাম্মাৎ রুখসানা আক্তার, সাং- মৌড়াইল, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া -এর বিয়ে মরহুম সৈয়্যদ সালেহ আহ্মদ-এর পুত্র সৈয়্যদ রাহাত আহমদ, সাং- মৌড়াইল, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২০/১০/০৩ তারিখ, রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়,আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। ন্যাশনাল রিশতানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৯৩/০৩, তারিখ ১২/১১/০৩।

❑ জনাব শিকদার মোহাম্মদ নজিব-এর কন্যা মোসাম্মাৎ ফারজান শিকদার, সাং- নাটাই, ডাকঘর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া - জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া -এর বিয়ে জনাব জায়েদ আহমদ-এর পুত্র জাবেদ আহমদ, জাকিরা মঞ্জিল, পাওয়ার হাউজ রোড, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৪/১০/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়,আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশতানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৯৪/০৩, তারিখ ১২/১১/০৩।

❑ জনাব আমীরুল হাসান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ ফাহমিদা হাসান, গ্রাম ও ডাকঘর- তারুয়া, বর্তমানে- কলেজ পাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া -এর বিয়ে জনাব আব্দুল হাশিম-এর পুত্র জনাব সাজেদ আহমদ, সাং- সিমরাইল কান্দি, দক্ষিণ আহমদী পাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৪/১০/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়,আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ শামসুল ইসলাম, মোয়াল্লেম।

ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৯৫/০৩, তারিখ ১২/১১/০৩।

❑ জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার-এর কন্যা মোসাম্মাৎ আবিদা নুসরাত সরকার, সাং- ফতুল্লা, জেলা-নারায়ণগঞ্জ-এর বিয়ে জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ শিকদার-এর পুত্র জনাব শিকদার মোঃ নূর আলম, সাং- শিকদার মঞ্জিল,পশ্চিম মেন্ডা, বাইপাস রোড, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে ৭০,০০১/= (সত্তর হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৪/১১/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়,আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশতানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৯৬/০৩, তারিখ ২৭/১১/০৩।

❑ জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন-এর কন্যা মোসাম্মাৎ শারমীন নাহার স্নিগ্ধা, সাং- শালগাঁও, বর্তমানে কান্দিপাড়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিয়ে জনাব মোঃ কুদ্দুস মিয়া-এর পুত্র জনাব মিনারুল ইসলাম, সাং- কান্দিপাড়া, আহমদীয়া পাড়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৫/১২/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়,আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন আলহাজ্জ মোশাররফ হোসেন, পিতা-মরহুম আবদুল গফুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ।

ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৯৮/০৩, তারিখ ১৭/১২/০৩।

❑ জনাব মোহাম্মদ নূর মিয়া-এর কন্যা মোসাম্মাৎ রোজিনা বেগম, সাং- ঘাটুরা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিয়ে মরহুম সৈয়দ আব্দুল আউয়াল-এর পুত্র জনাব সৈয়দ ছাবিল আহমেদ, সাং- মৌড়াইল, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে টাকা ৫০,০০১/= (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৬/১২/০৩ তারিখ, রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরা, ঘাটুরা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়,আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ আব্দুস সালাম পিতা-আল্হাজ্জ ইব্রাহীম সরকার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৯৯/০৩, তারিখ ১৭/১২/০৩।

❑জনাব লোকমান খান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নিগার সুলতানা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিয়ে মরহুম ফিরোজ আহমদ-এর পুত্র জনাব মোকাব্বের আহমদ, সাং- কান্দিপাড়া, উত্তর আহমদী পাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে টাকা ৭৫,০০০/= (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ৩০/১১/০৩ তারিখ, রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়,আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন আল্হাজ্জ মোশাররফ হোসেন, পিতা- মরহুম আব্দুল গফুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪০০/০৩, তারিখ ১৭/১২/০৩।

❑ জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন-এর কন্যা মোসাম্মাৎ জেবিন সুলতানা, সাং- কামার কোণা, কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর বিয়ে জনাব মোঃ আবুল খায়ের-এর পুত্র জনাব মোবারক হোসেন সুমন, সাং- ঘাগৈর, কটিয়াদী, জেলা- কিশোরগঞ্জ-এর সাথে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৯/১২/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদী মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়,আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব এম, এ, হান্নান, পিতা-জনাব আবু মূছা, কিশোরগঞ্জ।

ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪০২/০৩, তারিখ ২৩/১২/০৩।

❑ জনাব আব্দুল কাদির-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মমতাজ বেগম সাথী, সাং- সন্তাপুর, ফতুল্লা জেলা-নারায়ণগঞ্জ-এর বিয়ে জনাব আবু সাঈদ আহমদ-এর পুত্র জনাব সোহেল আহমদ, সাং- বীরগঞ্জ, জেলা- দিনাজপুর-এর সাথে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৩/০৬/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা দারুত তবলীগ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়,আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। এর রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪০৩/০৩, তারিখ ২৬/১২/০৩।

এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

নববর্ষের শুভেচ্ছা

হিজরী শামসী ও ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা।

- নির্বাহী সম্পাদক

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

CONCORD

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 66 ◆ 12th Issue December 31, 2003 ◆ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com